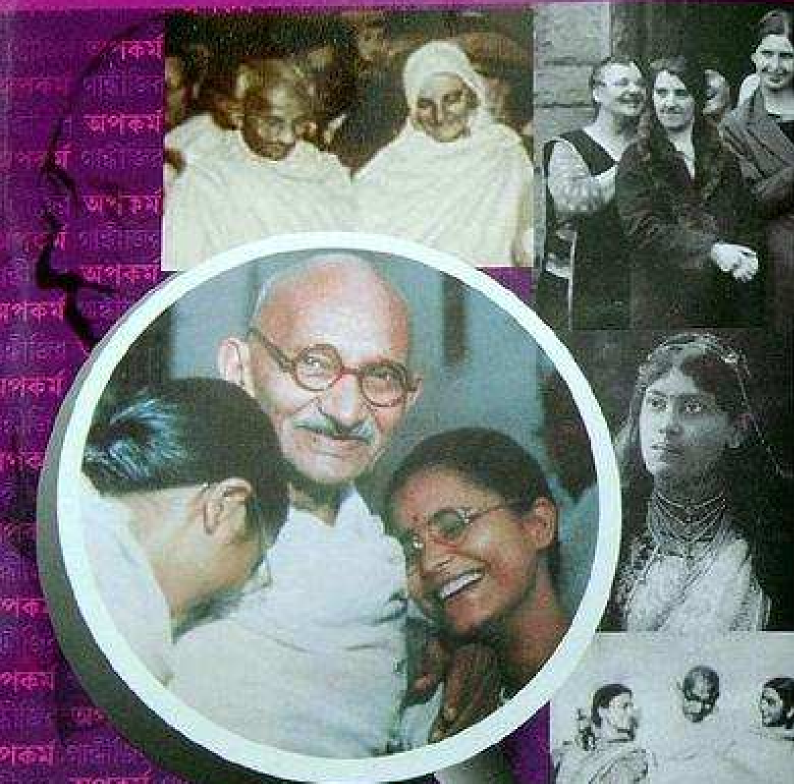
গান্ধীজির অপকর্ম



অলোককৃষ্ণ চক্রবর্তী

গান্ধীজির অপকর্ম

অলোককৃষ্ণ চক্রবর্তী

এস আর পাবলিকেশন
৮৩, বালিগঞ্জ গার্ডেন্স্
কলকাতা-৭০০ ০২৯

অলোককৃষ্ণ চক্রবর্তী সম্পাদিত গ্রন্থ

বিশ্বসেরা ১০১ গল্প
বিশ্বসেরা জোক্‌স সমগ্র
রবীন্দ্রনাথের ভয়ের গল্প
পঞ্চপাণ্ডব
সহস্রাব্দের সেরা গোয়েন্দা গল্প
শতাব্দীর সেরা কিশোর গল্প
শতাব্দীর সেরা কল্পবিজ্ঞানের গল্প
সহস্রাব্দের সেরা ভূতের গল্প
মণিকাঞ্চন
বিশ্বশ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা রহস্য
চাঁদের হাট
বিশ্বসেরা ভূতের গল্প
হাঁড়ি ভর্তি ভূত
সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন
তাজা প্রেমের গল্প
অদ্ভুত যত ভূত
মণিমাণিক
ছুটির আনন্দ
ছুটির আকাশ
ছুটির রোদ্দুর
ভয়ঙ্কর সব ভূতের গল্প
সহস্রাব্দের সেরা হাসির গল্প
সহস্রাব্দের সেরা গল্প
আন্তর্জাতিক গল্প
কথামালার গল্প
পঞ্চতন্ত্রের গল্প

অলোককৃষ্ণ চক্রবর্তীর গ্রন্থ

নেতাজি সুভাষ সমগ্র
সুভাষ সমগ্র (জীবন ও রহস্য)
ভোম্বলদা সমগ্র (শিশুকিশোর গল্প ও উপন্যাস)
শৌলমারীর সাধু কি নেতাজি? (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
চরম মুহূর্তে নেতাজি
সুভাষ ও এমিলি (বিবাহ-রহস্য)
শ্রুতিনাট্যে নেতাজিজীবন-রহস্য
শতরূপে সুভাষ
নারী ও নেতাজি
রেনকোজির ভস্ম-রহস্য
প্রধানমন্ত্রী-রহস্য
ধর্মের নামে
ধর্মের ভয়ে (গল্প)
কলির কেষ্ট (গল্প)
প্রেম শেখো প্রেম করো (প্রেমের গল্প)
ভোম্বলদার কাণ্ডকারখানা (কিশোর গল্প)
ভোম্বলদার কারসাজি (কিশোর গল্প)
ভোম্বলদার কেরামতি (কিশোর গল্প)
ভোম্বলদা একাই ১০০ (কিশোর গল্প)
গোয়েন্দা ভোম্বলদা (কিশোর গোয়েন্দা গল্প)
আমি ও সানিয়া (উপন্যাস)
কেউ পাবে না রেহাই (কাব্যগ্রন্থ)
তার নামে (কাব্যগ্রন্থ)
আবৃত্তির কবিতা
ছন্দেভরা মিষ্টি ছড়া
মহীয়সী নারী (জীবনী)
গান্ধীজির অপকর্ম
ভূতের রাজা দিল সাজা (ভূতের গল্প)
ভূতের কাণ্ডকারখানা
বিচিত্রা

যে কথাটা বলা দরকার

ছেলেবেলায় আমার শিশু মনে অদ্ভুত প্রভাব ফেলেছিল 'গান্ধী' নামটা। ভাবতাম এটা বুঝি কোনও দেবতার নাম। দেবতার নামের মতো এই নামটিও আমার অবুঝ মনে অপরিসীম ভক্তি সঞ্চার করত। তাই গান্ধীকে তখন দেবতা বলেই জানতাম। কিশোর বয়সে কিছুটা বোধশক্তি হলে বুঝলাম গান্ধী একজন মানুষ, কোনও দেবতা নন। তবে বিরাট মানুষ তিনি। তারপর আরও বয়স বাড়তে যখন বেশ কিছুটা বোধোদয় হল, তখন বুঝলাম বিরাট মানুষ হলেও ত্রুটিমুক্ত নন গান্ধী। তারও পর লেখালেখির জগতে প্রবেশ করে তাঁর অনেক দোষত্রুটি চোখে পড়ে। তারও অনেক পরে গবেষণার কাজে হাত দিয়ে দেখি অন্য গান্ধীকে — যাঁর মধ্যে রয়েছে একটা ছদ্মবেশ আর অজস্র অসংখ্য অগুনতি দোষ। এই সব দোষের জন্যই দেশের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। এবং সেই জন্যই সেটা তুলে ধরা আমি জাতীয় কর্তব্য বলে মনে করি।

গান্ধীজির জন্যই ভারতের শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক নেতাজি সুভাষকে আমরা হারিয়েছি, স্বাধীনতা আন্দোলন বারবার ব্যাহত হয়েছে এবং দেশভাগ হয়েছে। অসংলগ্ন এই নেতার দ্বিচারিতার অন্ত ছিল না।

সুন্দরী যুবতীদের সঙ্গে নগ্ন হয়ে তিনি একই বিছানায় রাত্রিযাপন করতেন। এটাই নাকি তাঁর ব্রহ্মচর্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। আমার মনে হয় গালভরা শব্দটি ব্যবহার করলেও এটা স্রেফ বিকৃত যৌনাচার ছাড়া অন্য কিছু নয়। আমার সবচেয়ে খারাপ লেগেছে নিজের রক্তের সম্পর্কের সঙ্গে তাঁর এই বিকৃত যৌনাচার। মনু গান্ধী সম্পর্কে গান্ধীজির নাতনি। তাঁর সঙ্গেও তিনি এইরকম নোংরামো করেছেন।

গান্ধীস্তুতি তো দেশে-বিদেশে সর্বত্রই শোনা যায়। আমিও তাঁর ভালো দিকের মহিমাকীর্তন করেছি। গান্ধীজি ইতিহাস পুরুষ। তাই তাঁর অন্ধকার দিকটাও দেখা দরকার। এই অন্ধকার দিকের কথা খুব কম লোকই জানে। তাঁর জীবনের আলোকিত অধ্যায়ই বেশিরভাগ লোকের জানা। তাই আমি সাদা গান্ধী ও কালো গান্ধী — দুটোই তুলে ধরেছি।

গান্ধীজি ছিলেন ব্রিটিশের চর। এই সত্যও আমি এই গ্রন্থে তুলে ধরেছি। তা ছাড়াও গান্ধী-চরিত্রের অনেক রহস্যময় দিক এখানে সন্নিবেশিত।

এই গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে একটি মাত্র মানুষের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেই মানুষটি আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন, অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন এবং অনুক্ষণ অনুরোধ করেছেন লেখার জন্য। সেই মানুষটির প্রেরণায় আমি উদ্বুদ্ধ হয়েছি। সেই মানুষটি হলেন আমার অনুজ লেখক ও উৎসব পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক উত্তমকুমার রায়। এই ব্যাপারে তাঁর কাছে আমি ঋণী।

লেখাটি উৎসর পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। তখন নাম ছিল 'গান্ধীজির কুকর্ম'। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার সময় নাম হয় 'গান্ধীজির অপকর্ম'। উৎসব পত্রিকার সকলকেই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই বন্ধু রামকিশোর চৌধুরী ও নিকুঞ্জবিহারী হাওলাদারকে। এই গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে অনেকেই জুগিয়েছেন প্রেরণা। তাঁদের কাছে আমি ঋণী। এই স্বল্প পরিসরে সকলের নাম উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি।

প্রয়োজনে অনেক কথার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। অনেকের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি তাঁরা গান্ধীজির অন্ধকার দিকটা বড় একটা জানেন না। গান্ধী মিথই বলতে গেলে সবাই জানেন। অথচ তা যে কত বড় ভুল সেটা প্রমাণ করার জন্যই এই পুনরাবৃত্তি। তাঁরা যেন ঠিকমতো এই অন্ধকার দিকটা খেয়াল করেন — সেটাই এই পুনরাবৃত্তির উদ্দেশ্য।

পাঠক-পাঠিকাদের এই লেখা ভালো লাগলে আমার শ্রম সার্থক। তাঁদের জানাই অভিনন্দন।

বিনীত

অলোককৃষ্ণ চক্রবর্তী

অলোককুঞ্জ
৮৩ বালিগঞ্জ গার্ডেন্স্
কলকাতা - ৭০০০২৯
ফোন ঃ ৯৮৩০১৮৯৮৮২
৩২৯৪-৪৯৬৫

যে সব বই ও পত্র-পত্রিকা থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে ঃ

গান্ধী রচনা সম্ভার (প্রথম খণ্ড)	মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী
[illegible] ও সামাজিক অবিচার	মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী
আমি সুভাষ বলছি	শৈলেশ দে
গান্ধীজী ও নেতাজী	শৈলেশ দে
সুভাষ চন্দ্র ঃ অবিনাশী আদর্শ	শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র
শুনুন ধর্মাবতার	নাথুরাম গড্‌সে
গান্ধী হত্যা কেন?	গোপাল গোড্‌সে
গান্ধীবাদের স্বরূপ	সুপ্রকাশ রায়
যে মহাত্মা সারা জীবন দ্বিচারিতা করে গেছেন	প্রিয়রঞ্জন কুণ্ডু
গান্ধীজীর আধ্যাত্মিক স্ত্রী ও সহযোগী মেয়েরা	দিগ্বিজয় দে সরকার
The Indian Struggle	Subhas Chandra Bose
The History of the Indian National Congress	Pattabhi Sitaramyya
India Wins Freedom	Abul Kalam Azad
History of Freedom Movement in India	R. C. Majumder
The Last Yeas of British India	Michael Edwards
The Last Days of the British Raj	Leonard Mosley
Discovery of India	Jawaharlal Nehru
An Autobiography	Jawaharlal Nehru
J.P.	Dr. Amarnath Seth
Mahatma Gandhi : Political Saint and unarmed Prophet	Dhananjoy Keer
Critique of Gandhi	M. M. Kothari
Gandhi — Truth behind a veil of Mist	Niharendu Dutt-Mazumder

Times of India ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা ঃ দেশ ঃ সাপ্তাহিক বসুমতী ঃ সংবাদ প্রতিদিন ঃ যমুনামতী ঃ আরিন্দা ঃ আত্মনিরীক্ষণ

গান্ধী-মিথ

ভারতবর্ষ চিরকালই ধর্মভীরু দেশ। তাই ধর্মের নামে এ দেশে অনেক অপকর্ম করা যায়। বুদ্ধিমান গান্ধীজি সেটা বুঝেই প্রথমে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। অঙ্গে ধারণ করেন সস্তার ঠেঙো ধুতি ও এক চিলতে চাদর। অতি সাধারণ ভাবেই জীবনযাপন শুরু করেন তিনি। এই ভাবে গান্ধীজি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিজেকে দারুণ জনপ্রিয় করে তোলেন। জনসাধারণ দেখল গান্ধীজির মধ্যে কোনও বিলাসিতা নেই। তিনি গরিব দেশের গরিব মানুষেরই সত্যিকারের প্রতিনিধি। ভারতের মূর্ত প্রতীক। দেখতে দেখতে তাই আপামর ভারতবাসী তাঁকে দেশনেতা হিসেবে বরণ করে নিল। বসাল দেবতার আসনে। এটাই চেয়েছিলেন তিনি মনেপ্রাণে। তাই হল। এ ভাবেই তিনি হয়ে উঠলেন কংগ্রেসের সর্বেসর্বা। ভারতের একনম্বর নেতা। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্ণধার। এ ব্যাপারে তাঁর কথাই শেষ কথা।

অহিংসা সাধক মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ঘোষণা করলেন হিংসায় নয়, অহিংসায় তিনি ভারতের স্বাধীনতা এনে দেবেন। তারপরই শোনা গেল গান্ধী-দর্শনের কথা। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল 'গান্ধী-মিথ'। সেই মিথের কথাই এখন বলব। যে সব মিথ তাঁর সম্বন্ধে শোনা যায় তা একটার পর একটা আমি তুলে ধরছি। আসলে সেই অতিকথাকে সত্যে পরিণত করার চেষ্টা চলেছিল।

(এক) গান্ধীজি দেশ-বিভাগ চাননি। এ বিষয়ে তাঁর বিখ্যাত উক্তি 'দেশভাগ হলে আমার মৃতদেহের উপর দিয়ে হবে। আমি জীবিত থাকতে দেশভাগে রাজি হব না।'

বেশিরভাগ দেশের মানুষই গান্ধীজির এই উক্তিটা জানে। অথচ এটাই গান্ধীজির সবচেয়ে বড় ধাপ্পা—সত্যের পূজারীর সবচেয়ে বড় মিথ্যে। দেশভাগের প্রায় তিন বছর আগেই জিন্নার মালাবার হিলের বাড়িতে এক গোপন বৈঠকে পাকিস্তান মেনে নেন গান্ধীজি। ভারতের অখণ্ডতা শেষ করেন সবচেয়ে আগে তিনি। এখানেই শেষ নয়। আরও আছে। কংগ্রেস-ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে দেশ-বিভাগের প্রস্তাব গৃহীত হলে তিনি তা সমর্থন করেন। অথচ প্রায় সবাই জানে গান্ধীজির অমতে জিন্না-প্যাটেল-নেহেরু চক্রই দেশভাগ করেছিল। আসলে গান্ধীজিই দেশভাগরে মূলে।

(দুই) গান্ধীজি সত্যের পূজারী। তাই আদালতে তাঁর ফটো টাঙানো হয়েছে। অথচ গান্ধীজি সত্যের চেয়ে মিথ্যে বলেছেন অনেক বেশি। তিনি মোটেই সত্যবাদী নন।

(তিন) সারা দুনিয়ায় এটা তাঁর বড় পরিচয় যে তিনি ছিলেন অহিংস। গান্ধীজি কোনও দিনও অহিংস ছিলেন না। তিনি ছিলেন সহিংস এবং সুবিধাবাদী। অহিংসার

মুখোশ পরে থাকতেন। মুখোশের অন্তরালে অনেক অন্যায় কাজ করে গেছেন তিনি দিনের পর দিন।

(চার) তাঁর দ্বিচারিতার অন্ত ছিল না। এই দ্বিচারিতার জন্যই বহু দেশপ্রেমিক ঠিকমতো দেশের কাজ করতে পারেননি। এই দ্বিচারিতার নাম গান্ধী-দর্শন।

(পাঁচ) জনসাধারণের চোখে গান্ধী ছিলেন দেবতা। পাঁচ সন্তানের পিতা হয়েও তিনি ব্রহ্মচারী। একটি সন্তান অবশ্য অকালেই মারা যায়। নিজে নগ্ন হয়ে যুবতী মহিলাদের নগ্ন করে একসঙ্গে রাত্রিযাপন করতেন। অন্ধ ভক্তরা ভাবত এটা দেবতার লীলাখেলা।

(ছয়) আগেই বলেছি লোকের কাছে গান্ধীজি দরিদ্র ভারতের প্রতীক। এখানে অধিকাংশ মানুষের বলতে গেলে লজ্জা ঢাকার মতো বস্ত্র মেলে না। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটে। নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। এই অবস্থায় কী করে তিনি ভালো পোশাক পরেন? কী করেই বা ভালোমন্দ খান? পোশাকের কথা তো বলা হয়েছে এবং সবাই তা দেখতেও পান। এবার আমি তাঁর যৎসামান্য খাদ্য-তালিকার কথা বলব ঃ

"(a) 'At the prayers he kept time by clapping. He ate walnuts and almonds.

(b) 'At 5-30 a.m. he took 16 ounces of orange or Musambi juice and at 7 a.m. 16 ounces of goat's milk and 8 ounces of orange or Musambi juice.

(c) 'At 12 noon he drank 16 ounces of goat's milk boiled down to 4 ounces, ate boiled vegetables 5 to 8 ounces, raw vegetables like tomatos. carrots etc. 8 ounces and a salad of green leaves like Palong or coriander 2 ounces.

(d) 'At 2 p.m. he drank a glass of coconut milk.

(e) 'At 5 p.m. he had 16 ounces of goat's milk boiled down to 4 ounces, 19 ounces of dates boiled in milk and a small quantity of fruit including kernel of coconut.

(f) 'Often he used to lie down for half an hour with a mud pack upon his abdomen and a cold mud poultice on his forehead.

'From the menu given above one can understand why a fellow passenger once asked Gandhi whether his food was worth only six pice and sharply cirticised him for not living upto his ideal of complete identification with the poor.

'At meal time Gandhi used a set of false denture. A patient of chronic amebiasis he suffered also from high blood pressure and

veins in his temples often throbbed, causing him acute discomfort.' (DK. P-756).

'Sri Prakash, a close devotee, writes that the hosts had some difficulty in procuring this milk the price of which always went up when Gandhiji was in the neighbourhood. If I remember aright, three seers of milk were necessary for him everyday and I also remember that I had to pay Rs. 3/- per seer for the same. Thus, Gandhi's life, though simple, was not very economical and Sarojini Naidu did tell Gandhiji one day : 'Bapu it costs a lot of money to keep you in poverty'." (Kothari. P.-109).

অর্থাৎ— (a) প্রার্থনার সময় তিনি হাততালি দিতেন। তিনি আখরোট এবং বাদাম খেতেন। (b) সকাল সাড়ে পাঁচটার সময় তিনি ১৬ আউন্স লেবুর অথবা মুসাম্বির রস খেতেন। সকাল সাতটার সময় ১৬ আউনস ছাগলের দুধ এবং ৮ আউন্স লেবু অথবা মুসাম্বির রস খেতেন। (c) বারোটার সময় ১৬ আউন্স ছাগলের দুধ জ্বালিয়ে ৪ আউন্স তৈরি করে খেতেন। ৫ থেকে ৮ আউন্স রান্না করা সবজি খেতেন। কাঁচা সবজি খেতেন যেমন টমেটো, গাজর ইত্যাদি ৮ আউন্স। সবুজ পাতার স্যালাড খেতেন যেমন পালং অথবা ধনেপাতা ২ আউন্স। (d) দু'টোর সময় তিনি এক গ্লাস ডাবের জল খেতেন। (e) বিকেল পাঁচটার সময় ১৬ আউনস ছাগলের দুধ জ্বালিয়ে চার আউন্স তৈরি করে খেতেন। ১৯ আউন্স খেজুর দুধে জ্বাল দিয়ে খেতেন। কিছু ফল খেতেন, তার মধ্যে নারকেলের শাঁসও থাকত। (f) প্রায়ই তিনি আধঘন্টা শুয়ে থাকতেন তলপেটে মাটির আস্তরণ দিয়ে এবং কপালে ন্যাকড়ায় জড়ানো ঠাণ্ডা মাটির পুলটিস দিয়ে।

গান্ধীর একজন সহযাত্রী তাঁর দৈনিক খাদ্য তালিকা দেখে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন তাঁর খাবারের মূল্য কি ৬ পয়সা? তিনি গান্ধীর কঠোর সমালোচনা করে বলেছেন তিনি কেন গরিবের মতো জীবনযাপন করছেন না। খাবার সময় তিনি একসেট নকল দাঁত ব্যবহার করতেন। তিনি দীর্ঘ দিনের আমাশায়ের রোগী ছিলেন। তাঁর উচ্চ রক্তচাপ ছিল এবং কপালের নাড়ী ধড়ফড় করত — যা তাঁকে ভীষণ কষ্ট দিত। শ্রীপ্রকাশ একজন ঘনিষ্ঠ গান্ধীভক্ত, তিনি লিখেছেন ঃ গান্ধীজি যখন কাছাকাছি কোথাও যেতেন তখন অতিথি সেবকদের তাঁর জন্য ছাগলের দুধ সংগ্রহ করতে বেশ অসুবিধা হত। কারণ দুধের দাম সর্বদা বেড়ে যেত। আমি যদি ঠিকমতো স্মরণ করতে পারি, তাঁর জন্য প্রতিদিন তিন সের দুধ লাগত এবং আমি আরও স্মরণ করতে পারছি যে, আমাকে প্রতি সের দুধের দাম দিতে হত তিন টাকা করে। গান্ধীজির জীবনযাত্রা সাদাসিধে মনে হলেও, ব্যয়বহুল ছিল এবং সরোজিনী নাইডু একদিন গান্ধীকে

বলেছিলেন 'বাপু, আপনাকে দারিদ্র্যের মধ্যে রাখতে অনেক অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে।'

উপরোক্ত তালিকার বাইরে তিনি প্রতিদিন মধু খেতেন এবং গুজরাটি রুটি খেতেন। ঘি দিয়ে পা মালিশ করাতেন।

এই হচ্ছেন গরিবের প্রতিভূ গান্ধী মহারাজ। অনেক জিনিসেরই আসল সত্য ধীরে ধীরেই প্রকাশ পায়। গান্ধীজির অপকর্মও এখন এই ভাবে একের পর এক প্রকাশিত হচ্ছে। গান্ধী মিথ ভেঙে যাচ্ছে।

(সাত) মৃত্যুর সময় গান্ধীজির মুখে নাকি 'রাম' নাম শোনা গিয়েছিল। এটা গান্ধীজিকে দেবতা বানানোর আর একটি প্রচার। গুলি লাগার পর তাঁর মুখ থেকে 'আঃ' শব্দ বেরিয়ে এসেছিল। প্রচার হয়েছিল এই কথা 'হে রাম! হে ঈশ্বর'। এই কথাটা মনু গান্ধীই রটিয়েছিলেন। পিস্তলের তিন তিনটে গুলির পর এত কথা বলা অস্বাভাবিক। বলতে পারেনওনি।

এ রকম অনেক মিথই আছে গান্ধীজির জীবনে। মিথ মিথই। তা সত্য নয়। এই সব অতিকথা গান্ধী-শিষ্যরাই প্রচার করেছিল। এবং চতুর গান্ধীজির দ্বিচারিতাই এর জন্য বেশি দায়ী। এমন কথাও প্রচারিত আছে যে দেশ-বিভাগের সময় গান্ধীজি শিশুর মতো অসহায় ছিলেন। তাঁর কথা প্যাটেল জওহরলাল নেহরু প্রমুখ কেউ মানতে চাননি। এমনকী তাঁর চোখ থেকে জলও পড়েছিল। এ সবই মিথ্যে। এটা চতুর গান্ধীজির চালাকি। কিন্তু মানুষ একে সত্যি বলেই জানে। তাই এই 'মিথ' ভাঙার জন্য একই কথার মাঝেমধ্যে পুনরাবৃত্তি করব আমি।

গান্ধীজির ব্রহ্মচর্য পরীক্ষা না বিকৃত যৌনাচার?

দিনের পর দিন নিজে উলঙ্গ অবস্থায় থেকে উলঙ্গ সুন্দরী যুবতীদের সঙ্গে রাত্রিযাপন করতেন গান্ধীজি। এই বিকৃত যৌনাচার সম্বন্ধে তাঁরই শিষ্য-শিষ্যাদের কথা তুলে দিচ্ছি।

বল্লভভাই প্যাটেল পরিষ্কার বলেন — আপনি ব্রহ্মচারী নন, অধর্মচারী। ব্রহ্মচারী হলে এমন পরীক্ষার প্রয়োজন নেই। আর ব্রহ্মচারী না হলে এই কাজ অধর্মের।

বিনোবাভাবের বক্তব্য — তিনি যদি ব্রহ্মচারী হন তবে এই পরীক্ষার প্রয়োজন নেই। আর তিনি যদি ব্রহ্মচারী না হন তবে এই পরীক্ষা অকারণ ঝুঁকিপূর্ণ। ...এ যেন কৃষ্ণলীলা।

অধ্যাপক নির্মল বসু গান্ধীজির এই ধরনের রাত্রিযাপন সুনজরে দেখেননি। গান্ধীজি নিজে নগ্ন হয়ে সুন্দরী নারীদের নগ্ন করে শয্যা-সঙ্গিনী করাটা তাঁর বিকৃত

যৌনাচার ছাড়া কিছু নয়। তার ফলে গান্ধীজি তাদের মানসিক রোগের কারণ হয়েছিলেন। সেই সব মেয়েরা মূর্ছা যেত। অর্থাৎ, মৃগি রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। নির্মল বসু এই নোংরা ব্যাপার নিয়ে গান্ধীজির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন।

নিজের নাতনি মনু গান্ধীর সঙ্গে উলঙ্গ হয়ে শুয়ে থাকতেন গান্ধীজি। মনু একদিন বলেছিলেন, 'তুমি আমাকে একেবারে শেষ করে দিয়েছ।'

গান্ধীজির এই সব নোংরামি দেখে তাঁর একান্ত অনুগত গান্ধীভক্ত স্টেনোগ্রাফার পরশুরাম তাঁর কাছ থেকে চলে যান। বিশেষ করে নিজের নাতনির সঙ্গে গান্ধীজির চরম নোংরামি দেখে তিনি সহ্য করতে পারেননি।

এই ভাবে অনেকেই গান্ধীজির এই সব অপকর্মের জন্য তিতিবিরক্ত হন। অনেকে তাঁকে ছেড়ে চলে যান। অনেকে আশ্রমে থেকেই প্রতিবাদ করেন। অনেকে আবার তাঁকে মানতেনও না। তিনি অনেককে ভয়ও করতেন।

আগেই বলেছি পাঁচ ছেলের (একটি জন্মানোর পরই মারা যায়) পিতার ব্রহ্মচর্য পরীক্ষা করা কি আদৌ বিশ্বাসযোগ্য?

না। অবিশ্বাস্য! অকল্পনীয়! অবাস্তব!

এটা স্রেফ গান্ধী মহারাজের বিকৃত যৌনাচার।

গান্ধীজির জন্য কী ভাবে দেশের ক্ষতি হয়েছে

গান্ধীজি অহিংস ছিলেন না। অহিংসা ছিল তাঁর মুখোশ। নেতাজি সুভাষকে তিনি কংগ্রেস থেকে সরিয়েছিলেন হিংসার অনলে জ্বলে। প্রমাণ— ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরি কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচন। সুভাষ নির্বাচনে দাঁড়ালেন গান্ধীজির অমতে। কী, এত বড় স্পর্ধা সুভাষের! গান্ধীজি অবাক। তাই তিনি তাঁর মনোনীত প্রার্থী পট্টভি সীতারামাইয়াকে সুভাষের বিরুদ্ধে দাঁড় করালেন। জয়ী হলেন সুভাষ। ফল হল মারাত্মক। সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজির উক্তি: 'The defeat of Pattabhi Sitaramyya is my defeat'. অর্থাৎ, পট্টভি সীতারামাইয়ার পরাজয় মানে আমার পরাজয়। এ কী সাংঘাতিক কথা! জনগণের ভোটে নির্বাচিত সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসুর জয়ে হঠাৎ মহাত্মার মতো মানুষের এই ধরনের উক্তির কারণ কী? কারণ হিসেবে বলা হল গান্ধীজির নীতির কথা। গান্ধীজি অহিংসার পূজারী, অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী। সুভাষ ঠিক এর বিপরীত। তাই সুভাষের জয় মানেই গান্ধীজির অহিংস নীতির পরাজয়। কিন্তু সত্যিই কি তাই? আদৌ নয়। কারণ, গান্ধীজিই একসময় বলেছেন—আমাদের হাতে অস্ত্র নেই। থাকলে প্রতিটি ভারতবাসীকেই ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে

পরামর্শ দিতাম। অস্ত্র নেই বলেই আমি অহিংসার পথ বেছে নিয়েছি। তা হলে তিনি অহিংস কোথায়? অক্ষমতার জন্যই অহিংসার বুলি। আসলে সুচতুর গান্ধীজিকে বিচলিত করেছিল সুভাষের জয়। কেননা, গান্ধীজির মনোনীত প্রার্থী পট্টভি সীতারামাইয়াকে সমর্থন করেছিলেন গান্ধীবাদী সব নেতা। অর্থাৎ, কংগ্রেসের তাবড় তাবড় নেতারা। বলতে গেলে সুভাষ একা লড়েছেন তাঁদের বিরুদ্ধে নিজের অনুগামীদের সঙ্গে নিয়ে। একা সুভাষ যখন ধরাশায়ী করলেন গান্ধীজি সহ কংগ্রেসি রথী-মহারথীদের তখনই রব উঠল—গেল, গেল, সব গেল। টের পেলেন ভারতের একনম্বর নেতা তাঁর আসনও টলমল।

ব্যস, কংগ্রেসের গ্রেট ডিক্টেটর অহিংসার মুখোশ-পরা গান্ধীজি হিংসার অনলে জ্বলে ভারতের শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিককে সরিয়ে দিলেন কংগ্রেস থেকে। রাখলেন তাঁর স্তাবকদের — যারা ক্ষমতা ছাড়া অন্য কিছু বোঝে না।

আজ দেশের খুবই দুর্দিন। স্বাধীনতার পর থেকে বহু লোকের মুখেই শুনে আসছি নেতাজি থাকলে আমাদের আজ এই হাল হত না। কথাটা মিথ্যে নয়। দেশের দিকে তাকিয়ে কী দেখছি আমরা?

দেশ দুনীর্তিগ্রস্ত — সর্বত্র ঘুষ আর ঘুষ। ঘুষ ছাড়া কোনও কাজই হয় না। একটা ফাইল পর্যন্ত টেবিল থেকে সরে না। বেশিরভাগ দেশবাসী হয়েছে অমানবিক। স্বার্থ ছাড়া কেউ এক পা-ও নড়ে না। কারও মধ্যে জাতীয়তা বোধ নেই।

তা ছাড়া হু-হু করে দ্রব্যমূল্য বাড়ছে। দেনায় ডুবে আছে গোটা ভারতবর্ষ। বহু মানুষের বিশ্বাস নেতাজি থাকলে দেশের চেহারা বদলে যেত। আমিও তাই বিশ্বাস করি।

নির্ভীক নির্লোভ নেতাজি সবচেয়ে বেশি দেশের কথা ভাবতেন। বিবেকানন্দের মানসপুত্র নেতাজি সুভাষের কাছে 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরিয়সী'। এটা কি গান্ধীজি জানতেন না?

জানতেন সবই। তবুও নেতাজিকে সরালেন কেন?

নিজের স্বার্থে। গান্ধীজির পরিবারের লোকজনও এই কারণে তাঁকে সুনজরে দেখতেন না। নিজের স্বার্থে সুভাষকে সরালেন তিনি তাঁর একনম্বর নেতৃত্বের সুরক্ষায়। সেটা যে দেশের কত বড় ক্ষতি আমরা টের পাচ্ছি হাড়েহাড়ে।

বারবার স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষতি হয়েছে গান্ধীজির জন্য। এই জন্য আন্দোলনকারীরা হতাশায় ভেঙে পড়েছেন। সত্যিকারের স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দিয়েছেন তিনি। যাঁদের মধ্যে ছিল না কোনওকিছু পাওয়ার লোভ, শুধু দেশের মুক্তির জন্য যাঁরা নিজেদের উৎসর্গ করে

গেলেন তাঁদের গুণ্ডা আখ্যা দিলেন জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, মাস্টারদা, ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেব প্রমুখ দেশপ্রেমিক বিপ্লবীরা গান্ধীজির অভিধানে সন্ত্রাসবাদী গুণ্ডা।

চমৎকার গান্ধীজি, চমৎকার! তোমার দেশপ্রেমের তুলনা নেই। যতই কংগ্রেস তোমার ঢেঁড়া পেটাক তাতে সত্য চাপা থাকে না। কংগ্রেস তো প্রচার করেই চলেছে— এই সব বিপ্লবী এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু যা করতে পারেননি, তুমি তাই করেছ। অর্থাৎ, বিপ্লবীদের বিপ্লব আর নেতাজি সুভাষের আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর কোনো অবদান নেই ভারতের স্বাধীনতায়, স্বাধীনতা এনেছে তোমার অহিংসা-মন্ত্র। এ রকম অসার তথ্যই কংগ্রেসের প্রচার। তাই তারা ইতিহাসের পাতা থেকে নেতাজিকে মুছে ফেলতে চায়। তোমাদের চক্রান্তেই নেতাজিকে দেশ ফিরে পেল না। তাতে কি দেশের অপরিসীম ক্ষতি হয়নি?

দেশভাগের জন্য গান্ধীজি সবচেয়ে বেশি দায়ী। তাঁর হঠকারিতার জন্যই ভারত ভেঙে দু-টুকরো হয়েছিল। দেশ-বিভাগে তিনি আগেই তাঁর সমর্থন জানিয়েছিলেন। এর ঘাড়ে — ওর ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে সাধু পুরুষ সাজবার চেষ্টা করেছেন। অথচ তিনিই দেশভাগের মূলে। গান্ধীজির অনেক অপকর্মের মধ্যে সবচেয়ে বড় অপকর্ম দেশ-বিভাগ। তাঁরই জন্য ভারতবর্ষের মানচিত্রই পালটে গেল। এর পরে আসব এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায়।

মহাত্মার উক্তি!

১৬ জুলাই, ১৯২১ লন্ডন থেকে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে জাহাজ এসে পৌঁছল বোম্বাই বন্দরে। জাহাজ থেকে নেমে একটা বিস্মিত আঘাতে ভারাক্রান্ত হয়ে গেল তাঁর মন। মহাত্মা গান্ধী উড়িষ্যার এক জনসভায় তাঁর ভাষণে কবীর ও নানকের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে **রামমোহনকে একজন 'বামন' (Pygmy) বলেছেন।** এই সংবাদ আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ল দেশের এখানে-ওখানে সর্বত্র।

এই ব্যাপারটা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ C. F. Andrews-কে চিঠি লেখেন ঃ

'...I strongly protest against Mahatma Gandhi's depreciation of such geat personalities of modern India as Rammohan Ray in his ideal for declaiming against our modern education. Every Indian ought to be proud of the fact that, inspite of immense disadvantages, India still has been able to produce greatness of personality in her children, such as we find Rammohan Ray.'

এই চিঠি লেখার দু'মাস পরেও কবি কিন্তু ভুলতে পারেননি রামমোহন সম্পর্কে গান্ধীজির এই জঘন্য উক্তি। বোম্বাই থেকে শান্তিনিকেতনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন তিনি। বর্ধমান স্টেশনে তাঁকে সংবর্ধনা জানাতে উপস্থিত প্রশান্তচন্দ্র মহলনাবীশ। কবিকে তিনি প্রণাম করতেই কবির মুখ থেকে ঝরে পড়ল কাতরোক্তি — 'প্রশান্ত, তিনি রামমোহনকে যেখানে pygmy মনে করেন সেই দেশে আমি ফিরে এলুম।' কিছু কাজের কথা বলার পর কবি আবার বলেন—'বম্বেতে যখন জাহাজ পৌঁছল, দেশের মাটিতে পা দেবার আগেই একখানা খবরের কাগজ হাতে পড়ল। তাতে দেখি রামমোহন রায় pigmy. কেননা, তিনি ইংরেজি শিখেছিলেন। এই হল, দেশের প্রথম খবর। তখন থেকে সে-কথা আমি কিছুতে ভুলতে পারছিনে।' (কবি-কথা বিশ্বভারতী পত্রিকা ঃ দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা)।

গান্ধীজি কংগ্রেস থেকে সুভাষকে বহিষ্কার করলে কবিগুরু তাঁকে তার করলেন ঃ 'Owing gravely critical situation all over India and especially in Bengal would urge congress working Committee immediately remove ban against Subhas and invite his cordial co-operation in supreme interest national unity.'

গান্ধীজি এ কথায় কর্ণপাত করলেন না। উলটে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করলেন দীনবন্ধু এন্ড্রুজকে লেখা এক চিঠিতে ঃ '...I feel that Subhas is behaving like a spoilt child.' অর্থাৎ, সুভাষ একটা বকাটে ছেলে।

এরকম আরও কয়েকটা বকাটে ছেলে ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করলে দেশের চেহারা পালটে যেত।

সুভাষের ব্যাপারে গান্ধীজির আরও একটা মন্তব্যের কথা বলি।

১৯২৮ সাল। কলকাতা কংগ্রেস। সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহরু। আর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক (G.O.C.) হলেন সুভাষ। তারই প্রস্তুতি চলছে আজ ক'দিন ধরে কলকাতার পার্ক সার্কাস ময়দানে।...

মতিলাল নেহরু তাঁর ভাষণে বলেন —'স্বেচ্ছাসেবক দলের অপূর্ব বিধিব্যবস্থা, অশ্বারোহী ও পদাতিক দলের শৃঙ্খলা ও গঠনের নৈপুণ্য, সর্বোপরি সর্বত্র অধিবাসীদের স্বদেশপ্রেমের যে উদ্বেল লহরীকীর্তন লক্ষ্য করিয়াছি, তাহাতে স্বরাজের স্বপ্নই আমার মনে উদিত হইয়াছে।'

সর্বত্র জয়ধ্বনি উঠল সুভাষের নামে। সর্বত্র তাঁর প্রশংসা। কিন্তু গান্ধীজি এই প্রশংসা সহ্য করতে পারলেন না। তাই তিনি তাঁর ভাষণে বললেন, 'এ হল পার্কসার্কাসের সার্কাস।'

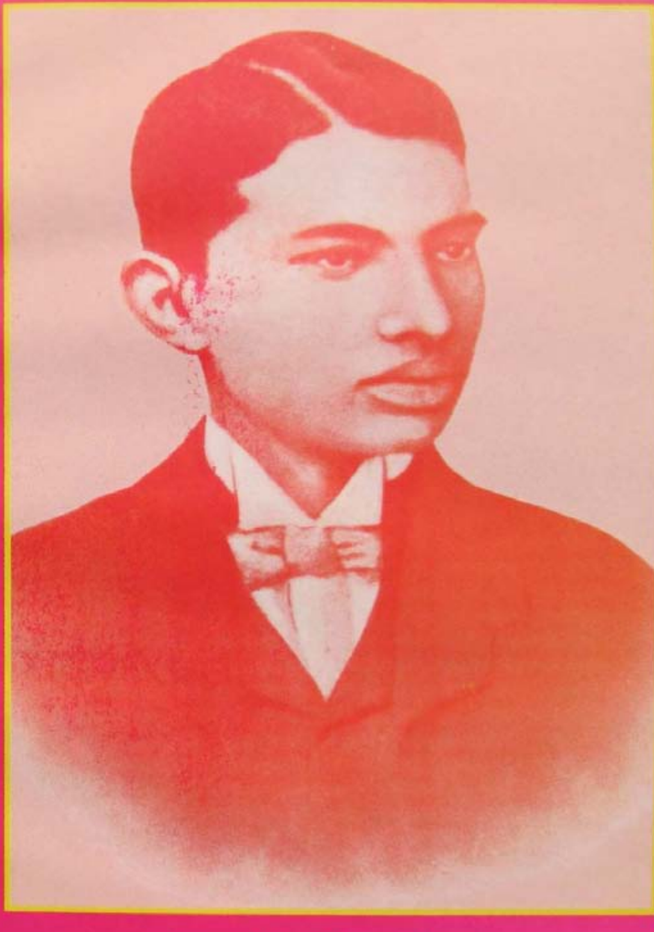
সুভাষ যেন সার্কাস' দেখালেন। কেন মহাত্মার এই নোংরা উক্তি?



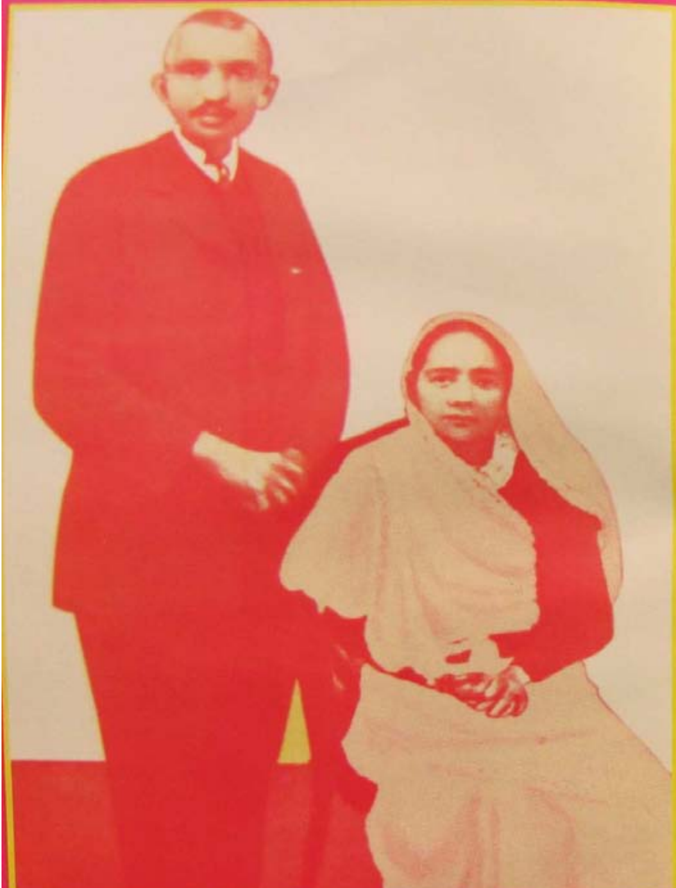
মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী



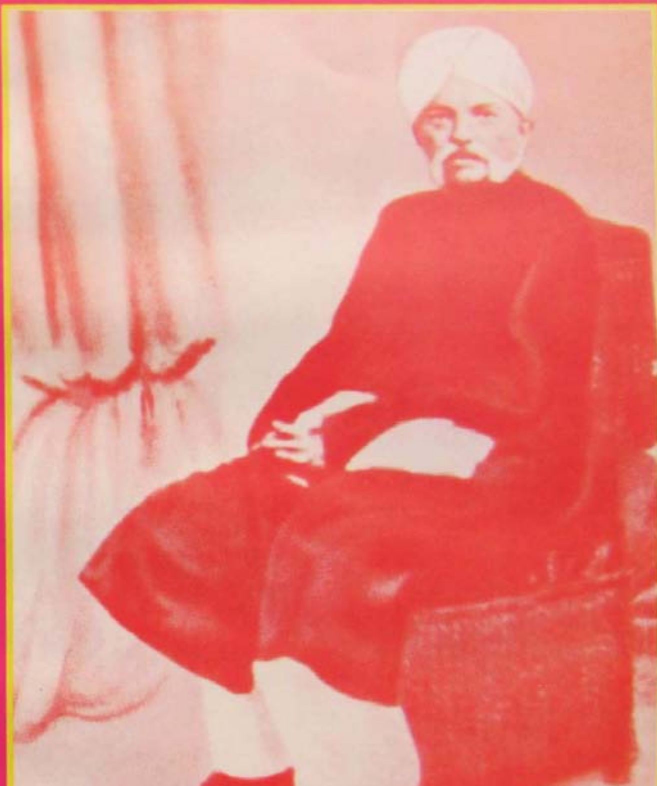
রাজকোট প্রাইমারি স্কুলের ছাত্র গান্ধী



লন্ডনে ব্যারিস্টারি পড়ার সময়



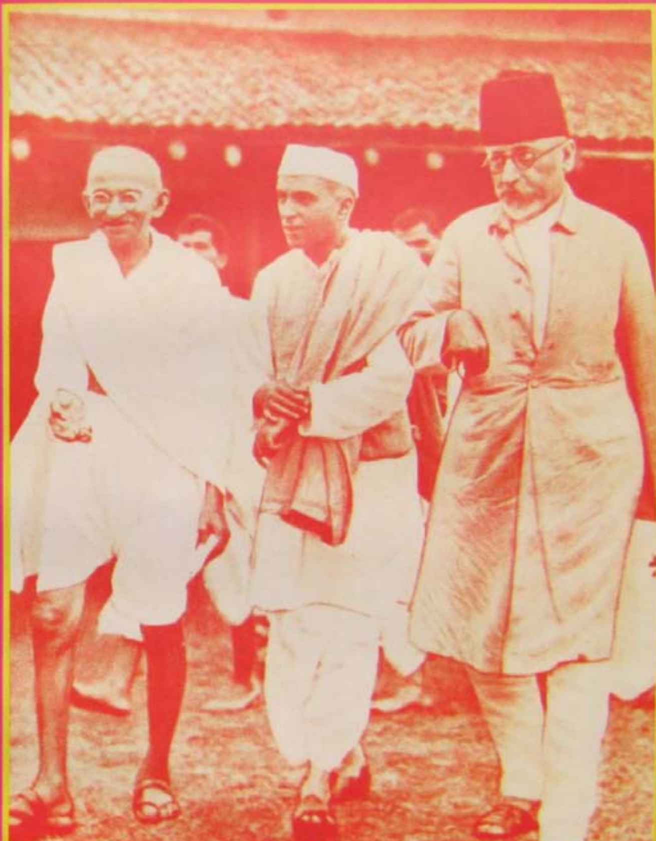
লন্ডনে সস্ত্রীক গান্ধী



গান্ধীজির পিতা করমচাঁদ উত্তমচাঁদ গান্ধী



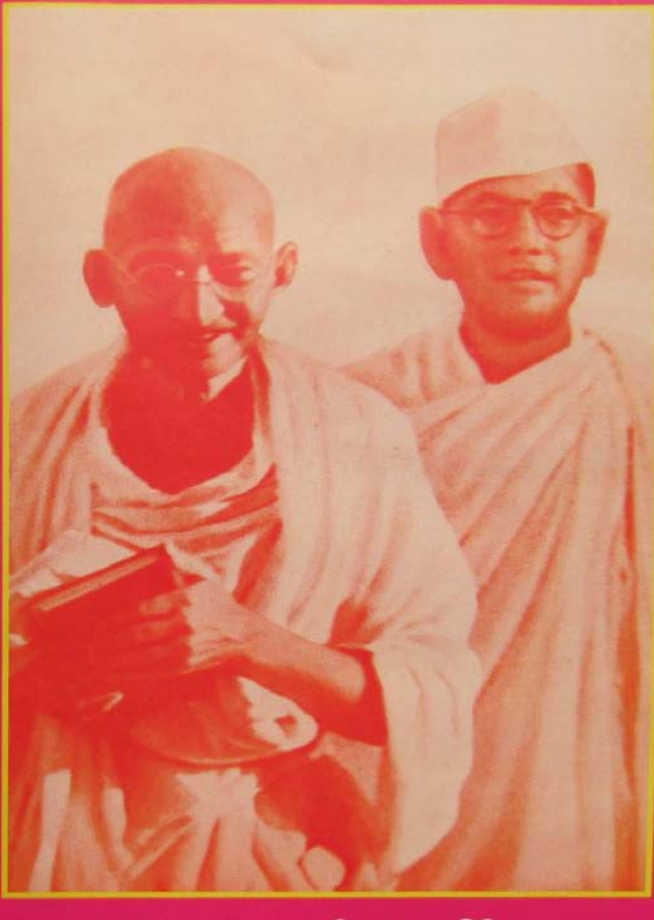
গভর্নর জেনারেল লর্ড লিনলিথগোর সঙ্গে গান্ধীজি



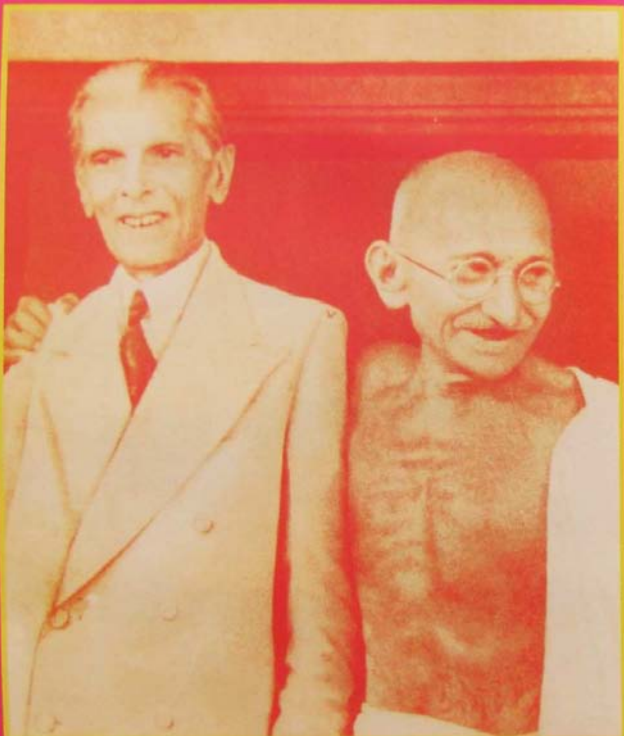
১৯৩৫ সালে নেহরু ও আজাদের সঙ্গে গান্ধীজি



খিলাফৎ আন্দোলনের সময় মৌলানা সৌকত আলির সঙ্গে গান্ধীজি



১৯২৮ সালে নেতাজির সঙ্গে গান্ধীজি



জিন্নার সঙ্গে গান্ধীজি



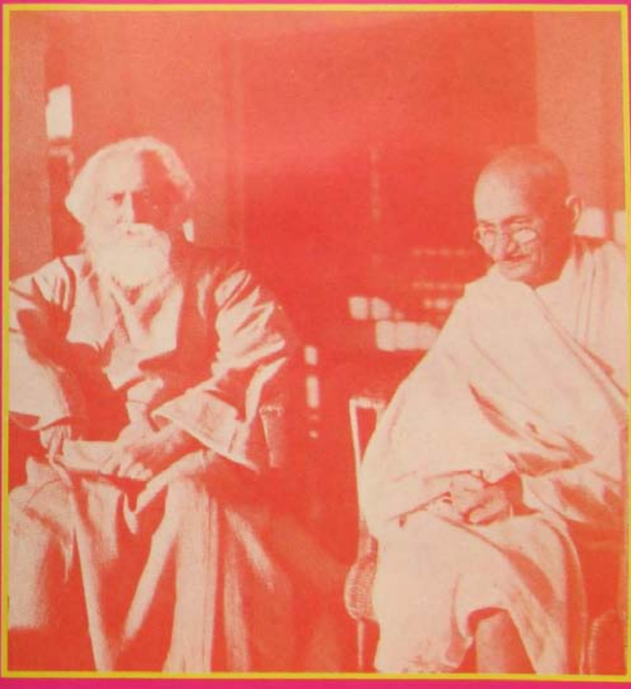
স্বাধীনতার পর দিল্লিতে সর্বভারতীয় কংগ্রেস সমাবেশে পুলকিত গান্ধীজি



দিল্লির আকাশবাণী পরিদর্শনে গান্ধীজি



ভ্রমণরত গান্ধীজি



শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গান্ধীজি



ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের সঙ্গে গান্ধীজি



পাঞ্জাবে ভ্রমণরত গান্ধীজি



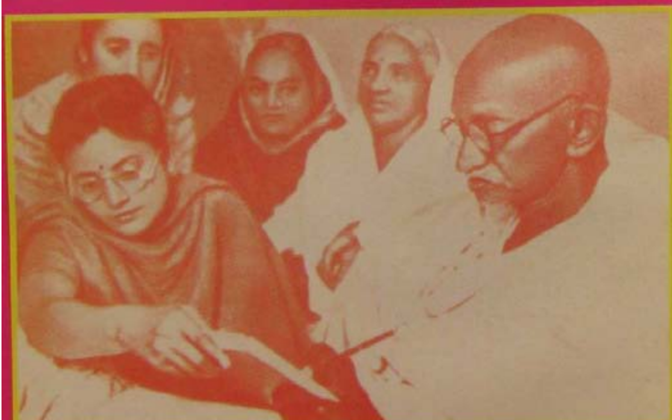
১৯৪৭ সালে প্রমোদতরী থেকে নামছেন গান্ধীজি



হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির জন্য যে মুসলিম মহিলা অনশন করেছিলেন
তাঁকে জল খাওয়াচ্ছেন গান্ধীজি



১৯৪৮ সালের ১৩ জানুয়ারি দিল্লিতে গান্ধীজির শেষ অনশন



অনশনের সময় মহিলারা

মধ্যরাতে মসীকৃষ্ণ অন্ধকার গায়ে মেখে এল ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট। ভারতবর্ষ স্বাধীন হল। স্বাধীনতা এল দেশ-বিভাগের বিনিময়ে। এক ঐতিহ্যশালী মহান দেশকে দ্বিখণ্ডিত করা হল। হতাশায় ডুবে গেল লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ। কপাল চাপড়াতে লাগল অসংখ্য অগুনতি অজস্র মুক্তিযোদ্ধা। স্বপ্ন ভঙ্গ হল দেশপ্রেমীদের।

সে কী অবস্থা দেশজুড়ে! কাতারে কাতারে ছিন্নমূল পরিবার চোদ্দপুরুষের ভিটেমাটি ফেলে পাকিস্তান থেকে আসতে লাগল ভারতে। তাদের স্থান মিলল রেলস্টেশনে, মাঠে-ময়দানে, পথেঘাটে। সহায়-সম্বলহীন অসহায় মানুষগুলো শেয়াল-কুকুরের মতো পড়ে থাকতে লাগল অনাহারে অনিদ্রায়। সুযোগসন্ধানীরা নারীদের ইজ্জত লুটল। সদ্য ফোটা কুসুমের মতো কিশোরীরাও রেহাই পেল না তাদের হাত থেকে। কী অপরিসীম অত্যাচারই না সহ্য করতে হয়েছিল তাদের! সেই সব করুণ দৃশ্যে মানুষের চোখ ফেটে জল আসতে লাগল।

একটা অখণ্ড দেশ দ্বিখণ্ডিত হল কেন? আর লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ সর্বস্বান্ত হল কেন? এর জন্য দায়ী কে? দায়ী কি শুধু মুসলিম লিগ?

না। দায়ী কংগ্রেসও। মুসলিম লিগের চেয়ে অনেক বেশি দায়ী কংগ্রেস। কংগ্রেস নেতাদের ক্ষমতা লোভের জন্য দেশটা দু-টুকরো হয়েছিল সেদিন। এ সত্য শোনা যাক কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতা আবুল কালাম আজাদের মুখ থেকেঃ

'After a few days Jawaharlal came to see me again. He began with a long preamble in which he emphasised that we should not indulge in wishful thinking, but face reality. Ultimately, he came to the point and asked me to give up my opposition to partition. He said that it was inevitable and it would not be wisdom not to oppose what was bound to happen. He also said that it would not be wise for me to oppose Lord Mountbatten on this issue.

...Now a situation had arisen where we (Congress) were becoming greater supporters of partition than Jinnah. I warned Jawaharlal that history would never forgive us if we agreed

to partition. The verdict would be that India was divided not only by Muslim Leauge, but by Congress.'

(India Wins Freedom : Moulana Abul Kalam Azad)

অর্থাৎ, কয়েকদিন পরে জওহরলাল আবার আমাকে দেখতে এলেন। অনেকক্ষণ ধরে নানা রকম কথার পর তিনি বললেন, আবেগে গা না ভাসিয়ে বাস্তবকে মেনে নেওয়াই হবে আমাদের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ। মোদ্দা কথা, তাঁর বক্তব্য হল আমি যেন দেশ-বিভাগের বিরোধিতা না করি। দেশ-বিভাগ হবেই। সুতরাং, যা অবশ্যম্ভাবী তা নিয়ে অযথা বাধা সৃষ্টি ঠিক না। এবং জওহরলাল এ-ও বললেন, আমি যেন মাউন্টব্যাটেনকে দেশ-বিভাগের ব্যাপারে কোনওরকম বাধা না দিই।

পরিস্থিতিটা এমন দাঁড়াল যে জিন্নার চেয়ে কংগ্রেসই দেশভাগের খুব বেশি সমর্থক হয়ে উঠল। আমি জওহরলালকে জানালাম, ইতিহাস কিন্তু আমাদের (কংগ্রেসকে) ক্ষমা করবে না, যদি আমরা দেশভাগে রাজি হয়ে যাই। তখন এটাই প্রমাণিত হবে ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল কেবলমাত্র মুসলিম লিগের জন্য নয়, কংগ্রেসের জন্যও। সোজা কথা, দেশভাগের ব্যাপারে কংগ্রেসই বেশি দায়ী।

সত্যিই তাই। কংগ্রেস নেতাদের ক্ষমতালোভের জন্যই দেশভাগ হয়েছিল। এই সব ক্ষমতালোভীরা কি দেশপ্রেমিক?

না। এরা দেশের শত্রু। এদের চেয়ে বড় শত্রু আর কারা হতে পারে! স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধীজির দ্বিচারিতার অন্ত ছিল না। জনসাধারণকে একটার পর একটা ধাপ্পা মেরেছেন তিনি। সত্যের পূজারী অসংখ্য মিথ্যা বলেছেন দিনের পর দিন। সুচতুর গান্ধীজির অবিমৃষ্যকারিতার জন্য ভারতবর্ষ দু-টুকরো হয়েছিল। সেই প্রসঙ্গটা আমি পরিষ্কার তুলে ধরছি। আবুল কালাম আজাদ একদিন গান্ধীজিকে দেশ-বিভাগের ব্যাপারে প্রশ্ন করেন, কী শুনছি বাপুজি, ভারত নাকি দু-টুকরো হয়ে যাবে? উত্তরে গান্ধীজি বলেন, 'India could only be partitioned over my dead body alone. So long as I am alive, I will never agree to the partition of India.'

অর্থাৎ, ভারতবর্ষ ভাগ হলে আমার মৃতদেহের উপর দিয়ে হবে। যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি কিছুতেই দেশভাগে সম্মতি দেব না। এ যে কত বড় ধাপ্পা তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। আরও বিস্তারিতভাবে সচতুর গান্ধীজির দ্বিচারিতা ও ধাপ্পা আমি তুলে ধরছি :

'Let it not be said Gandhi was party to Indian Vivisection. But everyone today is impatient for Independence. Congress practically decided to accept partition. They have handed an wooden loaf in this new plan. If they eat, they die of colic, if they leave it, they starve.

We may not feel the full effect immediately but I can see clearly that the future of Independence gained at this price is going to be dark. I pray that God may not keep me alive to witness it.'

অর্থাৎ, এ কথা যেন না বলা হয় ভারত-বিভাগে গান্ধীর সম্মতি ছিল। আজ সবাই স্বাধীনতার জন্য ধৈর্য হারিয়েছে। কংগ্রেস দেশ-বিভাগ প্রস্তাব মেনে নিয়েছে। এই প্রস্তাবে তাদের হাতে একটি করে কাঠের রুটি দেওয়া হয়েছে। খেলে পেটের যন্ত্রণায় মারা যাবে। না খেলে অনাহারে মরতে হবে।

আমরা হয়তো এই মুহূর্তে এর ভয়াবহ পরিণতি বুঝতে পারছি না। কিন্তু আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি, এই ভাবে স্বাধীনতা এলে তার ভবিষ্যৎ হবে অন্ধকার। ঈশ্বর যেন আমাকে এটা দেখার জন্য বাঁচিয়ে না রাখেন।

এ কথা বলার কিছুদিনের মধ্যেই গান্ধীজির মুখোশ খুলে গেল। ধরা পড়ল তাঁর আসল রূপ। তিনি যে দেশের সর্বনাশের মূলে সেই কথাই বলব এখন।

১৫ জুন, ১৯৪৭। দেশ-বিভাগের প্রস্তাব গৃহীত হল কংগ্রেস অধিবেশনে। বিস্ময়ের ব্যাপার হল কোনও প্রতিবাদ না করে সেই প্রস্তাব প্রথমেই সমর্থন করলেন গান্ধীজি স্বয়ং। কেন তিনি দেশ-বিভাগের প্রস্তাব প্রথমেই সমর্থন করলেন? তাঁর বক্তব্য, 'ওয়ার্কিং কমিটি যখন এটা মেনে নিয়েছে, তখন নিখিল ভারত কংগ্রেসের পক্ষে সে প্রস্তাব গ্রহণ করাই উচিত। অন্যথায় কী মনে করবে সারা দুনিয়ার মানুষ! হয়তো দেশের নেতৃত্ব তখন নতুন লোকের হাতে গিয়ে পড়বে, ফলে দেশ কংগ্রেসের অভিজ্ঞ লোকদের সহায়তা থেকে বঞ্চিত হবে। সেটা কোনওভাবেই কাম্য নয়।'

এটাই কি গান্ধীজির মনের কথা? এটা কি সত্য?

আদৌ নয়। আসল কথা হল, তখনও নেতাজির ফিরে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। নেতাজির বিমান-দুর্ঘটনায় মৃত্যু একটা মিথ্যে রটনা। এটা গান্ধীজি-নেহরু

ভালো করেই জানতেন। তাই তাঁরা দু'জনে এবং আরও কিছু কংগ্রেসি নেতা দেশটাকে ভাগ করলেন নেতাজির ভয়ে।

কেন এই ভয়?

কারণ, নেতাজির ভাবমূর্তি এবং জনপ্রিয়তা তখন এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছিল যে তিনি ভারতে এলেই সব ক্ষমতা তাঁর হাতে চলে যাবে। এটা এঁরা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তো গান্ধীজি বলেছেন, 'হয়তো দেশের নেতৃত্ব তখন নতুন লোকের হাতে গিয়ে পড়বে।'

নতুন লোক মানে কে?

নেতাজি! নেতাজি! নেতাজি!

নেতাজি ছাড়া এমন কে ছিলেন সেদিন যিনি গান্ধী-নেহরু-প্যাটেলদের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবার যোগ্যতা রাখেন! আর তাঁর সেই যোগ্যতা ত্রিপুরি কংগ্রেসে প্রমাণিত ১৯৩৯ সালে। তখন এঁরা পরাজিত হয়েছিলেন নেতাজির কাছে। ১৯৪৭ সালে তো নেতাজি রূপকথার রাজপুত্র। গগনচুম্বী তাঁর জনপ্রিয়তা। সুতরাং, নেতাজি ফিরে এলে তো এঁরা শেষ।

গান্ধীজির একনম্বর নেতা থাকা শেষ। শেষ জওহরলালের প্রধানমন্ত্রী হবার স্বপ্ন। তাই নেতাজির ভয়ে চক্রান্তকারীরা দেশভাগ করল।

স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধীজির অবদান নিশ্চয়ই আছে। তার মানে এই নয় যে তিনি দেশটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলবেন। যে লোক একবার বলছেন, তিনি দেশভাগ হতে দেবেন না, সেই লোকই আবার দেশভাগে সমর্থন জানালেন প্রায় সবার আগে। আরও অদ্ভুত ব্যাপার তিনিই আবার বলছেন, কেউ যেন না বলে ভারত ভাগে গান্ধীর সম্মতি ছিল।

এত বড় রাজনৈতিক মিথ্যাচারী পৃথিবীতে কটা জন্মেছিল আমার জানা নেই। তবে ওই সময়ে গান্ধীজির মতো সুচতুর নেতা একজনও ভারতবর্ষে ছিল না। অথচ এই মিথ্যাচারী মানুষটাকে আমরা সত্যের প্রতীক হিসেবে জানি। আদালতে এঁরই ছবি বিচারকদের ঘরে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আর্থিক লেনদেনে এঁরই মুখ দেখতে হয় আমাদের। এই সব কিছুর পেছনে কি কোনও কারণ আছে?

অবশ্যই আছে।

কী সেই কারণ?

কংগ্রেসকে বাঁচানো। তার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল রাখা।

গান্ধীজি জাতির জনক। অহিংস সাধক। আর গান্ধীজি মানেই কংগ্রেস। সুতরাং, কংগ্রেস জাতির জনকের দল। তাই তো আজ এক অর্ধশিক্ষিতা বিদেশিনী ভারতের সর্বেসর্বা। তাঁর অল্পবয়সী রাজনীতিতে অজ্ঞ পুত্রও ভাবী প্রধানমন্ত্রী। পুরো কংগ্রেস দলটাই নেহরু-গান্ধী পরিবারের হাতের পুতুল। এই পরিবারের বিরুদ্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করার ক্ষমতা কংগ্রেস দলের মধ্যে কারও নেই। নেহরু-গান্ধী পরিবার যা বলবে তাই মানতে হবে। না মানলে দূর হটো, কংগ্রেস থেকে বিদেয় হও। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় ভারতবর্ষে কি এখন বৃহন্নলারা সংখ্যাগরিষ্ঠ!

এবার স্বাধীনতা আন্দোলনে নেহরুর ভূমিকার আরও কিছু কথা বলব। শুধু ক্ষমতা ছাড়া নেহরু বেশি কিছু বুঝতে চাইতেন না। বোঝেনওনি। তাঁর সাফ কথা—আগে চাই ক্ষমতা, তারপর বাকি সব। ক্ষমতালোভী জওহরলালের সে রকম একটি ঘটনার কথা এখানে তুলে ধরছি ঃ

'The Nawab of Bhupal chartered a Plane taking Jawaharlal Nehru to Singapore where Lord Wavell was ; he was then Viceroy. Gen. Auchinleck, Commander-in-Chief of the war was also there. Nehru was hesitant there. Lord Mountbatten who was the head of the South-East Asia Command to Singapore base, was also there. Jawharlal Nehru was given certain questions by Lord Mountbatten. He said, look here, Scotland Yard has not yet written off Subhas as dead or gone or disappeared never to come. If that is so, if Subhas comes back to India, will you be the Prime Minister or Subhas will be? Question No. 2 : Was supposing the country is not partitioned, will Bengal contribute the Prime Ministership or will U. P. contribute the Prime Ministership? The hint was very clear and the vacillating great leader agreed to partition.' (Lok Sabha Debates–Vol. VI, pages-316&317).

অর্থাৎ, একটি প্লেন ভাড়া করে ভূপালের নবাব জওহরলাল নেহরুকে

সিঙ্গাপুরে নিয়ে যান। বড়লাট লর্ড ওয়াভেল তখন সেখানে ছিলেন। উপস্থিত সেখানে যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক সেনাপতি অচিনলেক। দক্ষিণ-পূর্ব রণাঙ্গনের সর্বেসর্বা লর্ড মাউন্টব্যাটেনও তখন সিঙ্গাপুরেই। দ্বিধাগ্রস্ত জওহরলাল নেহরুকে মাউন্টব্যাটেন কয়েকটি প্রশ্ন করেন। এবং পরিষ্কার বলেন, স্কটল্যান্ড গোয়েন্দারা সুভাষকে মৃত অথবা চিরতরে নিরুদ্দেশ বলে ঘোষণা করেনি। এখন তুমি ভেবে দেখো, সুভাষ যদি ফিরে আসে তবে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী কে হবে, তুমি না সুভাষ? আর যদি দেশভাগ না হয়, তাহলে কোন্ প্রদেশ থেকে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হবে? বাংলা না উত্তরপ্রদেশ? ইঙ্গিত খুবই স্পষ্ট। অতঃপর অস্থিরচিত্ত বিরাট নেতা দেশভাগে তাঁর সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

এই হলেন জওহরলাল নেহরু। এটাই তাঁর আসল পরিচয়। এই পরিচয়ই বারবার ফুটে উঠেছে নেহরু-চরিত্রে। আজও স্বাধীনতালাভের ৬৩ বছর পরেও একই চরিত্র দেখি ওই পরিবারের। অর্থাৎ, নেহরু-গান্ধী পরিবার ক্ষমতালোভী। ক্ষমতা ছাড়া এঁরা কিছুই বোঝেন না। দেশপ্রেম-ট্রেমের ধারেকাছেও এঁরা নেই। থাকবেন কী করে? ক্ষমতার লোভ আর দেশকে ভালোবাসা—এই দুটি ব্যাপার তো সম্পূর্ণ বিপরীত। হাজার হাজার শহিদ জীবন উৎসর্গ করেছেন দেশকে ভালোবেসে—ক্ষমতা লাভের জন্য নয়। আর এই পরিবারের লক্ষ্য ক্ষমতা পাওয়া—যেন তেন প্রকারেণ ক্ষমতা চাই। এই ক্ষমতালোভের জন্যই কিন্তু অপঘাতে মৃত্যু হল তিনটি প্রাণের। তবুও এঁদের শিক্ষা হল না। হবেই বা কী করে? কংগ্রেসে না আছে কোনও সাহসী নেতা, না আছে কোনও প্রতিবাদের সুর। উপরন্তু সনিয়া-রাহুলকে তৈলমর্দনে এখন ব্যস্ত সবাই। তাই তো পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীকে বলছেন মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ। ধিক-ধিক, শতধিক এই সব নেতাকে। নেহরু-গান্ধী পরিবারের কথায় আবার পরে আসব। কংগ্রেসের আরও নানা কীর্তিকলাপের কথাও তখন তুলে ধরব। এবার আসা যাক নেতাজি-প্রসঙ্গে। তাহলে তিন নেতার মধ্যে তফাতটাও জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে।

নেতাজির লক্ষ্য ছিল দেশের স্বাধীনতা। কংগ্রেসের ক্ষমতালোভীদের মতো গদিতে বসা নয়। সে সত্য তিনি ১৯৪৩ সালে টোকিওতে গ্রেট এশিয়াটিক কন্‌ফারেন্সে যোগদান করে প্রমাণ করেছেন। মঞ্চে জাপানের প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজো বলেন, ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে। এবং অচিরেই হবে। আর ভারতবর্ষের সর্বেসর্বা

হবেন আমাদের মাননীয় চন্দ্র বোস (সুভাষচন্দ্র বোস)। সঙ্গে সঙ্গে নেতাজি বাধা দিয়ে বলেন, 'ভারতবর্ষের সর্বেসর্বা কে হবেন তা ঠিক করবেন ভারতবাসী, জাপানের প্রধানমন্ত্রী নন। সেখানে সর্বেসর্বা হবার মতো অনেক যোগ্য লোক আছেন। যেমন—গান্ধীজি, জওহরলাল নেহরু, আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ। আমি খুশি হব জাপানের প্রধানমন্ত্রী যদি তাঁর উক্তি প্রত্যাহার করেন।'

তাই হল। প্রধানমন্ত্রী তোজো তাঁর উক্তি প্রত্যাহার করে নিলেন। এই হলেন নেতাজি। ভারতের শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক। তুলনাহীন তাঁর দেশপ্রেম। তিনি বুঝেছিলেন আবেদন-নিবেদনে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছ থেকে স্বাধীনতা আদায় করা যায় না। কায়েমি শক্তির কাছে অহিংসার মধুর বাণী 'শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।' তাই মিষ্টি মধুর বাণীর পরিবর্তে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন নেতাজি সুভাষ সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের বিরুদ্ধে। সুভাষ বোসই তখন সারা ভারতে একমাত্র নেতা যাঁর দূরদর্শিতা অতুলনীয়। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির মূলে তাঁর অবদানই সবচেয়ে বেশি।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের কথা থেকেই এই সত্য প্রমাণিত হবে। সেই কথাই তুলে ধরছি এখানে ঃ

'১৯৪৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে ভারতীয় নৌবাহিনী বিদ্রোহ করে। ঠিক তার পরদিনই বিলাতে পার্লামেন্টে ব্রিটিশ মন্ত্রী ঘোষণা করিলেন যে, তিনজন সদস্য (Cabinet Mission) ভারতে গিয়ে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করিবেন।... এটাও বিশেষভাবে স্মরণীয় যে, জাপানী সৈন্য রেঙ্গুন অধিকারের চারদিন পরেই ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতির দূত হিসাবে ক্রিপসকে (Cripps) ভারতে পাঠাইবার ঘোষণা করা হইয়াছিল। যাঁহারা মনে করেন মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনেই ভারত স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল তাঁহাদের মনে রাখা দরকার যে, ১৯৩৩ সালে আইন অমান্য আন্দোলন ব্যর্থ ও পরিত্যক্ত হওয়ার পরে গান্ধী ভারতের মুক্তিসংগ্রামে আর কোনও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন নাই। অপর দিকে সুভাষচন্দ্র কর্তৃক 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ' গঠন ও সমগ্র ভারতবর্ষে স্বাধীনতার অগ্রদূত বলিয়া ইহার সংবর্ধনায় ইংরেজ যখন বুঝিতে পারিল যে, যে ভারতীয় সিপাহীদের সাহায্যে তাহারা ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিল এবং এই বিশাল সাম্রাজ্য বিদেশীয় আক্রমণ ও স্বদেশীয় বিপ্লবের হাত হইতে এতদিন রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল, সেই সিপাহীদের উপর আর নির্ভর করা

চলে না, সেই দিনই ভারতকে তাহারা সর্বপ্রথম পূর্ণ স্বাধীনতা দিবার প্রতিশ্রুতি দিল।'

এই প্রসঙ্গে আরও একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। তৎকালীন কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ চক্রবর্তী এবং ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী লর্ড অ্যাটলির কথোপকথন ঃ

'আমি যখন অস্থায়ী রাজ্যপাল ছিলাম তখন যিনি আমাদিগকে স্বাধীনতা দিয়া ভারত হইতে ইংরেজ শাসন সরাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন সেই লর্ড অ্যাটলি ভারত ভ্রমণে আসিয়া কলিকাতায় রাজভবনে দুই দিন অবস্থান করেন। তখন তাঁহার সহিত আমার ইংরেজ ভারত হইতে চলিয়া যাইবার প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা হইয়াছিল। আমি তাঁহাকে সরাসরি প্রশ্ন করিয়াছিলাম যে, গান্ধীর 'কুইট ইন্ডিয়া' আন্দোলন তো ১৯৪৭ সালের বহু পূর্বেই মিয়াইয়া গিয়াছিল, ১৯৪৭ সালে এমন কোনও পরিস্থিতি বর্তমান ছিল না যাহার জন্য ইংরেজদের তাড়াহুড়া করিয়া এ দেশ ছাড়িয়া যাওয়ার প্রয়োজন ঘটিয়াছিল—তবে তাহারা গেল কেন? উত্তরে অ্যাটলি কয়েকটি কারণের উল্লেখ করিয়াছিলেন। সেগুলির মধ্যে প্রধান ছিল নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু কর্তৃক ভারতের স্থলবাহিনী ও নৌ-বাহিনীযুক্ত দেশীয় সেনানীদের ইংরেজ শাসনের প্রতি আনুগত্যের ভিত্তি শিথিল করিয়া দেওয়া। আলোচনার শেষের দিকে আমি লর্ড অ্যাটলিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম ইংরেজদের ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্তে গান্ধীর কার্যকলাপের প্রভাব কতটা ছিল? এই প্রশ্ন শুনিবার পর অ্যাটলির ওষ্ঠদ্বয় একটা অবজ্ঞাসূচক হাস্যে বিস্তৃত হইল এবং তিনি চিবাইয়া চিবাইয়া বলিলেন—mi-ni-mal.

লর্ড অ্যাটলির সঙ্গে আমার এই আলাপের কথা নেতাজী ভবনে এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলাম। All India Radio সেই বক্তৃতার বিবরণ broadcast করিয়াছিল, কিন্তু অ্যাটলির নেতাজী সম্পর্কিত কথাগুলি বাদ দিয়া।'

এই হচ্ছে কংগ্রেস। এই তার আসল পরিচয়।

ছলে-বলে-কৌশলে কংগ্রেসিরা ইতিহাস থেকে নেতাজিকে মুছে ফেলতে চায়। কারণ, তিনি সৎ, সত্যবাদী এবং সত্যিকারের দেশপ্রেমিক। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নেতাজি সুভাষের অবদানই সবচেয়ে বেশি, গান্ধীজির নয়। এর উল্টোটাই কংগ্রেস প্রচার করছে। এমনকী চলচ্চিত্রে একটা ছবিতে বলা হয়েছে 'গান্ধীজির অহিংসা আন্দোলনে স্বাধীনতা এসেছে। গান্ধীজি অহিংসায়

যা করতে পেরেছেন, সুভাষ বোস সহিংসায় তা করতে পারেননি।' নেতাজিকে মুছে ফেলার চক্রান্ত সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত একইভাবে চলেছে। কিন্তু ইতিহাসকে মুছে ফেলা যায় না।

দেশটা ভাগ হল গান্ধী-জওহরলাল-প্যাটেলের জন্য। জিন্না নিজেই এ সত্য জানতেন যে, দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে একটা দেশকে ভাগ করা সত্যিই অসম্ভব ব্যাপার। সেই অসম্ভবও সম্ভব হয়েছিল এই তিনজনের জন্য।

কিন্তু নেতাজি সুভাষ তখন ভারতে থাকলে দেশভাগ কি সম্ভব হত?

না, হত না। এ সত্যও জিন্না জানতেন। তাই তিনি বলেছিলেন :

'I never thought it would happen. I never expected to see Pakistan in my life.' অর্থাৎ, আমি ভাবতেই পারিনি এরকম কিছু হতে পারে। আমি আমার জীবদ্দশায় পাকিস্তানের মুখ দেখতে পাব এটা আশাই করিনি। অথচ সেই পাকিস্তান তাঁকে উপঢৌকন দেওয়া হল।

দিল কারা?

গান্ধী-নেহরুরা।

কেন দিল?

স্রেফ ক্ষমতার লোভে। গান্ধীজি চাইলেন তাঁর একনম্বর নেতৃত্ব টিকিয়ে রাখতে। জওহরলাল চাইলেন প্রধানমন্ত্রীর গদিটি দখল করতে। এই হল এঁদের চরিত্র। তাই আজ দেশের এই দুরবস্থা!

আর সুভাষচন্দ্র! ত্যাগে, কর্মে, চরিত্রে, পৌরুষে, স্বপ্নে ও সংগঠনে একেশ্বর সূর্য! নিষ্কাশিত তলোয়ারের মতো তিনি উদার ও উজ্জ্বল। অভ্রংলিহ আগুনের মতো তিনি দীপ্যমান। তিনি ত্যাগী-যোগী ও সত্যিকারের সাধক। তাই অসম্ভব বলে কোনও কথা তাঁর অভিধানে ছিল না। তিনি অসম্ভবের নায়ক। ভারতের শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক।

গান্ধীজি ছিলেন ব্রিটিশের চর। অহিংসার মুখোশ পরে অনেক অন্যায় কাজ করে গেছেন দিনের পর দিন। তিনি বহুরূপী। কখনও মহাত্মা, কখনও মহামানব, আবার কখনও একনম্বর নেতা। ব্রিটিশের চর বলেই তিনি ছিলেন ডিক্টেটর। কংগ্রেসের সর্বেসর্বা। তাঁর কথাই কংগ্রেসে শেষ কথা। গণতন্ত্রের ধার ধারতেন না। না হলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত সভাপতি সুভাষচন্দ্রকে তিনি কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত করেন কী করে? শেঠ গোবিন্দ দাসের মুখ থেকে শোনা যাক

সেকথা : 'ফ্যাসিস্টদের মধ্যে মুসোলিনির, নাৎসীদের মধ্যে হিটলারের আর কমিউনিস্টদের মধ্যে স্ট্যালিনের যে স্থান কংগ্রেসের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীরও সেই স্থান।'

জওহরলাল নেহরুও গান্ধীর মৃত্যুর পর ওই একই স্থান দখল করেছিলেন। তিনি যা বলবেন তাই মেনে নিতে হবে কংগ্রেসকে। এবং এখনও সেই একই নিয়ম চলছে এই দলে। অর্থাৎ নেহরু-গান্ধী পরিবারের কথাই শেষ কথা। এখন সনিয়া গান্ধী যা বলবেন তাই মানতে হবে কংগ্রেসিদের। এবং নেহরু-গান্ধী পরিবার হবে ভারতের সর্বেসর্বা। এ যেন রাজবংশ। বংশপরম্পরায় আধিপত্য বিস্তার এবং সিংহাসন দখলের জন্য যা খুশি তাই করে যাবেন এঁরা। এই ভাবেই এই পরিবার উত্তরসূরি তৈরি করে গেছে। কী অদ্ভুত কৌশল এঁদের! ভাবলে অবাক হতে হয়। এর মূলে গান্ধী মহারাজ।

'ভুবনেশ্বরের রাজভবনে অসুস্থ প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু শুয়ে আছেন। এদিকে তখন কংগ্রেস অধিবেশন চলছে। হঠাৎ নেহরু রাজভবনে কংগ্রেস সভাপতি কামরাজকে ডেকে পাঠান। কামরাজ ঘরে ঢুকে দেখলেন প্রধানমন্ত্রী একেবারে ভেঙে পড়েছেন। সে মানুষই আর নেই। বিছানায় শুয়ে আছেন। ডাক্তারদের নির্দেশ, দু-চার মিনিটের বেশি একসঙ্গে কথা বলতে দেবেন না। উত্তেজিত হতে তো কিছুতেই দেবেন না। তাহলে আবার স্ট্রোক হতে পারে। এবং সেটা হবে মারাত্মক।

নেহরুর শয্যার পাশে গিয়ে বসলেন কামরাজ। ছোট্ট ছেলেটির মতো। নেহরু তাঁর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে দু-বার বললেন, 'আমার পরে ইন্দুরই হওয়া উচিত, আমার পরে ইন্দুরই হওয়া উচিত।' (বরুণ সেনগুপ্ত)।

এই হল নেহরু পরিবারের কৌশল। সবসময় এঁরা নিজেরা কিছু বলবেন না। অন্যকে দিয়ে বলাবেন। এই একই কৌশল রাজীব-সনিয়া-রাহুলের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়েছে। রাজনীতি কতটুকু বুঝতেন পাইলট থেকে প্রাইম মিনিস্টার হওয়া রাজীব গান্ধী? কতটুকু বোঝেন সনিয়া গান্ধী? কতটুকু বোঝেন রাজনীতিতে কদিন আগে ঢোকা রাহুল গান্ধী? তবুও এঁরা দেশ ও দল চালাচ্ছেন এবং চালাবেনও। কারণ, এঁদের গায়ে নেহরু-গান্ধী পরিবারের স্ট্যাম্প লাগানো আছে। আর এই স্ট্যাম্পের ভয়েই ক্ষমতালোভী ব্যক্তিত্বহীন কংগ্রেসিরা

অর্ধশিক্ষিতা এক নারীর কথায় ওঠে-বসে। অনেক রাজনৈতিক দলের নেতারাও এদেরই মতো তাঁর কথায় ওঠে-বসে।

গান্ধীজির জন্মদিনে সারা দেশে ছুটি থাকে। নেহরুজির জন্মদিন পালিত হয় শিশুদিবস হিসেবে। আর নেতাজির জন্মদিন?

না, পালিত হবে না। দেশপ্রেম দিবস হিসেবে তো মোটেই না। এই হল কংগ্রেস। এরা চায় নেতাজিকে মুছে ফেলতে।

এমনকী কংগ্রেস সরকার শাহনওয়াজ কমিটি এবং খোসলা কমিশনের রিপোর্ট ফলাও করে প্রচার করেছিল। কেননা, সেই দুটি রিপোর্টে বলা হয়েছিল তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু হয়েছে। আমরা গবেষণা করতে গিয়ে বুঝেছি এই দুটো রিপোর্টই পূর্বপরিকল্পিত। নেহরু এবং নেহরু-তনয়ার ইচ্ছেমতোই তৈরি হয়েছে।

কিন্তু পরবর্তীকালে তাইহোকু কর্তৃপক্ষ যখন জানাল যে ওই সময় তাইহোকু বিমানবন্দরে কোনও বিমান দুর্ঘটনাই হয়নি তখন কংগ্রেস সরকার বিপাকে পড়ল। মুখার্জী কমিশন তার রিপোর্টে এই কথাই পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছে। বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু হয়নি। ব্যস, আর যায় কোথায়। কংগ্রেস সরকার রিপোর্টটিই প্রকাশ করল না।

গান্ধীজি নেতাজিকে সহ্য করতে পারতেন না। কারণ, নেতাজি তাঁর পোষ মানেননি। জওহরলাল কিন্তু তাঁর কথায় উঠতেন-বসতেন। তিনি তো এটাই চেয়েছিলেন। তাই নেহরু পরিবারের জন্য অনেক কিছু করেছেন গান্ধীজি। সে কথা সবাই জানে। এ সত্য আজ দিবালোকের মতো স্পষ্ট।

এবার গরিবের বন্ধু গান্ধীজির কথা তুলে ধরছি ঃ

'গান্ধী ভারতের বুর্জোয়া জমিদার শ্রেণীর জন্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যে ভারতের গণশক্তিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে হাতিয়াররূপে ব্যবহার করিবার কৌশল গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই গণশক্তিকে রাজনৈতিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা অত্যন্ত বিপদজনক বুঝিয়া গান্ধী তাঁহার পরিচালিত সংগ্রামে শ্রমিক কৃষক জনসাধারণের জন্য বহু প্রকারের শর্ত ও বাধা-নিষেধ আরোপ করিয়াছিলেন। অহিংসা পালনের শর্তটি ছিল তাহাদের মধ্যে সর্বপ্রধান। তিনি অহিংসাকে করিয়াছিলেন তাঁহার সংগ্রামের মূলভিত্তি। অথচ এই অহিংসা হইল গণ-সংগ্রামের পক্ষে সম্পূর্ণ বিরোধী। প্রকৃতপক্ষে অহিংসা হইল, লেনিনের কথায় ঃ

"শাসকগোষ্ঠী আর তাহাদের বশম্বদ বুদ্ধিজীবীদের তাত্ত্বিক নীতির ধাপ্পাবাজি। স্বৈরাচারী শাসন ও শোষণ ব্যবস্থাকে অক্ষত রাখিবার উদ্দেশ্যেই ইহাদের দালালদের দ্বারা জনসাধারণের জন্য চিরকাল অহিংসার বুলি প্রচারিত হইয়া আসিতেছে।" [Lenin : Ibid, p. 81]

জনসাধারণের বৈপ্লবিক সংগ্রামে বাধাদানই গান্ধীর অহিংসানীতির মূল উদ্দেশ্য ঃ

"গান্ধীর অহিংসা ছিল জনসাধারণের বৈপ্লবিক সংগ্রামের রাশ টানিয়া ধরিবার এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার রক্ষার একটি বিশেষ পদ্ধতি।"

[Joan Beauchamp : British Imperialism in india–p. 170]

গান্ধীর সংগ্রামের কর্মপন্থা লক্ষ্য করিলেই তাঁহার অহিংসার স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। তিনি তাঁহার সত্যাগ্রহ-সংগ্রামে একদিকে বুদ্ধিজীবী মধ্যশ্রেণীকে অফিস-কাছারি-স্কুল-কলেজ ত্যাগ করিয়া প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রামে যোগদান করিতে আহ্বান করিয়াছেন, আর অন্যদিকে শান্তিবাদী অহিংসা-মন্ত্রের বাধা-নিষেধ আরোপ করিয়া জনসাধারণকে সংগ্রামে যোগদান করিতে বাধা দিয়াছেন। চৌরিচৌরা ও গোরক্ষপুরের ঘটনা, মোপলা-বিদ্রোহ প্রভৃতি কৃষকদের সংহিংস সংগ্রামের রূপ দেখিয়াই ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া গণ-সংগ্রামে "অহিংসা অমান্য করা হইয়াছে" বলিয়া গান্ধী ১৯২১ সালের জাতীয় সংগ্রাম বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

এইভাবে অহিংসার নামে গণ-সংগ্রাম বন্ধ হইয়াছিল ১৯১৯ সালে, ১৯২১-২২ সালে ও ১৯৩০-৩২ সালে। ১৯৩২ সালের পর জনসাধারণের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ভয়ে ভীত হইয়া গান্ধী আর কোনদিনই গণ-সংগ্রাম আরম্ভের কল্পনাও করেন নাই। গান্ধী বিভিন্ন সময়ের সংগ্রামে জনসাধারণের জন্য অহিংসামূলক নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের নীতি গ্রহণ করিয়াছেন এবং জনসাধারণ অহিংসার বাধা-নিষেধ লঙ্ঘন করিবামাত্র সমস্ত দোষ তাহাদের উপর চাপাইয়া দিয়া সংগ্রাম বন্ধ করিয়াছেন। অথচ সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী যখন উন্মত্ত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রের মত রাইফেল মেশিনগান হইতে অবিশ্রান্ত গোলাবর্ষণ আর উড়োজাহাজ হইতে বোমা-বর্ষণ করিয়া শ্রমিক-কৃষকদের অগণিত সংখ্যায় হত্যা করিয়াছে, তখন এই অহিংসার পূজারী গান্ধী 'মহাত্মা'র শ্রীমুখ হইতে একটি সামান্য প্রতিবাদ-বাক্যও উচ্চারিত হয় নাই।

সুতরাং ভারতের জাতীয় সংগ্রামের "মহানায়ক গান্ধীর নীতিতে অহিংসা

কেবল ভারতের শ্রমিক-কৃষক জনসাধারণেরই অবশ্য পালনীয়, আর সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীকে দেওয়া হইয়াছে রাইফেল-মেশিনগান হইতে গুলিগোলা এবং উড়োজাহাজ হইতে বোমা-বর্ষণে শ্রমিক-কৃষক হত্যার অবাধ স্বাধীনতা। বৈদেশিক শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা অবাধে ভারতবাসীদের হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদেরও প্রয়োজন নাই। ইহাই গান্ধীর অহিংসা-নীতির স্বরূপ।

বৃটিশ শাসনের উপর জনসাধারণের প্রত্যেকটি আঘাতে বাধাদানের জন্যই গান্ধী সারাজীবন প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সংগ্রামী জনসাধারণকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে শাসকগোষ্ঠীকে অবাধ সুযোগদানের জন্যই গান্ধী বলিয়াছিলেন :

"প্রতিপক্ষের আঘাত যতই তীব্র হউক না কেন, তাহাতে ক্ষিপ্ত হইয়া জনসাধারণের কিছুতেই বলপ্রয়োগ করা উচিত নয়। শাসকগোষ্ঠীর হৃদয় জয় করিয়াই তাহাদিগকে মুক্তি অর্জন করিতে হইবে।"

[C.F. Andrews : Views of Mahatma Gandhi, p. 285]

গান্ধী তাঁহার অহিংস সত্যাগ্রহ-সংগ্রামকে প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদের হাতিয়ারে পরিণত করিয়াছিলেন। গণ-সংগ্রাম যাহাতে বৈপ্লবিক রূপ ধারণ করিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় বুর্জোয়া-জমিদারগোষ্ঠীর স্বার্থ বিপন্ন না করিতে পারে তাহার উদ্দেশ্যেই গান্ধী তাঁহার অহিংস সত্যাগ্রহের নীতির উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। গান্ধীর মতে, সংগ্রামী জনাসাধারণই, শ্রমিক-কৃষকই, ভারতের প্রধান শত্রু। এই শত্রুর বিরুদ্ধেই গান্ধী তাঁহার অহিংসার নীতিকে পরিচালিত করিয়াছিলেন।'

(গান্ধীবাদের স্বরূপ : সুপ্রকাশ রায়—পৃঃ ৩২-৩৩)

আগেও বলেছি গান্ধীজি ছিলেন ব্রিটিশের চর। এবং এই কথার বারবারই পুনরাবৃত্তি ঘটবে। এই সত্য বহু ঐতিহাসিকও জানেন না। জানেন না বলেই তাঁকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রদূত বলেন। তাঁর অহিংস আন্দোলনেই নাকি স্বাধীনতা এসেছে। তাই বুঝি মুদ্রায় এবং টাকার নোটে তাঁর ছবি।

কেন এই ছবি?

কংগ্রেস সরকারের জন্য। হৃতসর্বস্ব কংগ্রেসের এটাই তো এখন একমাত্র অস্ত্র। তাই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ওবামাকে এই তথাকথিত অহিংস সাধকের ছবি দেখানো হয়। সত্যিকারের দেশপ্রেমিক নেতাজির কথা বলা হয় না।

কেন নেতাজির কথা বলা হয় না? কেন তাঁর ছবি নোটে ছাপা হয় না? কেন বিবেকানন্দের ছবি বা রবীন্দ্রনাথের ছবি ছাপা হয় না?

সার্বিয়া-বসনিয়া প্রভৃতি দেশে তো নোটের উপর লেখকদের ছবি থাকে। আমাদের দেশে গান্ধী ছাড়া অন্য কারও ছবি থাকে না কেন? অথচ দ্বিচারিতায় তাঁর তুলনা হয় না।

গান্ধী-চরিত্রের আরও কিছু দিক তুলে ধরছি 'গান্ধীবাদের স্বরূপ' গ্রন্থ থেকে ঃ

'১৯৩০ সালে পেশোয়ারের মুসলমান জনসাধারণ—শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর সহিত যুদ্ধে শত শত জীবনবলি দিয়া ১০ দিনের জন্য পেশোয়ার শহরে স্বাধীন সরকার গঠন করে। পেশোয়ারের বিদ্রোহী মুসলমান জনসাধারণকে দমন করিবার জন্য বৃটিশ সরকার দুইটি হিন্দু গাড়োয়ালী সৈন্যদল প্রেরণ করিলে তাঁহারা বৃটিশ সেনাপতির নির্দেশ অমান্য ও বিদ্রোহীদের উপর গুলিবর্ষণ করিতে অস্বীকার করিয়া তাঁহাদের রাইফেলগুলি জনাসাধারণের হাতে তুলিয়া দেন। সেদিন এই গাড়োয়ালী সৈন্যরা হিন্দু- মুসলমান সম্প্রদায়ের সংগ্রামী ঐক্যের যে উজ্জ্বলতম আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন তাহার তুলনা কেবল ভারতবর্ষ নহে, সমগ্র পৃথিবীতেই বিরল। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সর্বাধিনায়ক ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আজীবন সেবক গান্ধীর নিকট ইহার তাৎপর্য ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। সশস্ত্র গণ-সংগ্রাম ও হিন্দু-মুসলমানের সংগ্রামী ঐক্যের আতঙ্কে দিশাহার গান্ধী গাড়োয়ালী সৈন্যগণের এই অতুলনীয় কার্যটিকে কুৎসিত ভাষায় ধিক্কৃত করেন। সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী দ্বারা এই গাড়োয়ালী সৈন্যদের শাস্তিদানকে ''কর্তব্যকর্মে অবহেলা'' ''অবাধ্যতা'' ও ''বিশ্বাসভঙ্গ''-এর জন্য ''উচিত শাস্তি '' বলিয়া তিনি সমর্থন করেন এবং ইহা দ্বারা হিন্দু-মুসলমানের সংগ্রামী ঐক্যের পথে পুনরায় বাধা সৃষ্টি করিতে সক্ষম হন।

হিন্দু-মুসলমানের মিলনের ভিত্তিতে পেশোয়ার ও শোলাপুরের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আতঙ্কে দিশাহারা হইয়াই গান্ধী শেষ পর্যন্ত ১৯৩০- ৩২ সালের দেশব্যাপী জাতীয় গণ-সংগ্রামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সংগ্রামের ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন।

গান্ধী হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের সংগ্রামী ঐক্যের উপর চরম আঘাত হানেন ১৯৪৬-৪৭ সালে এবং এই আঘাতের দ্বারাই তিনি সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারত ভাগের পথ প্রস্তুত করিয়া দেন। ১৯৪৬ সালে ভারতের হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ মিলিত হইয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের উপর শেষ আঘাত হানিতে আরম্ভ করে। বৃহৎ শিল্পাঞ্চলগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম, সমগ্র ভারতে কৃষকের

সামন্ততন্ত্র-বিরোধী সংগ্রাম (বিশেষত বাংলাদেশে ৫০ লক্ষ বর্গাচাষীর 'তেভাগার' সশস্ত্র সংগ্রাম), পুলিশ-বিদ্রোহ, জঙ্গি-বিমান বাহিনীর পাইলটদের বিদ্রোহ, ভারতীয় স্থল-সৈন্যবাহিনীর বিদ্রোহ, বোম্বাই ও অন্যান্য নৌ-ঘাঁটিতে ভারতীয় নৌ-সৈন্যদের ধর্মঘট, বিদ্রোহ ও সশস্ত্রসংগ্রাম, বোম্বাইয়ের রাজপথে শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণের 'ব্যারিকেড'-যুদ্ধ—সমস্ত কিছু মিলিয়া ভারতের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় বিপ্লব ও বৃহৎ বুর্জোয়া সামন্ততন্ত্র-বিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লব পূর্ণমাত্রায় আত্মপ্রকাশ করে। এই দেশব্যাপী বৈপ্লবিক গণ-সংগ্রামে ভারতের সমগ্র হিন্দু-মুসলমান—শ্রমিক-কৃষক-মধ্যশ্রেণীর জনসাধারণ—কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া সাম্রাজ্যবাদী শাসনকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিতে উদ্যত হয়। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বৃহৎ বুর্জোয়া এবং সামন্ততান্ত্রিক শোষণেরও অন্তিমকাল ঘনাইয়া আসে।

হিন্দু-মুসলমান শ্রমিক-কৃষক-মধ্যশ্রেণীর এই মিলিত মহা সংগ্রামের আতঙ্কে দিশাহারা হইয়া কংগ্রেস নেতৃত্ব যতপ্রকারে সম্ভব এই সংগ্রামের উপর, বিশষত এই সংগ্রামের মূল ভিত্তি হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক ঐক্যের উপর আঘাত করিতে থাকনে। অবশেষে আসরে অবতীর্ণ হন স্বয়ং গান্ধী। গান্ধী জানিতেন, হিন্দু-মুসলমানের সংগ্রামী ঐক্যই এই সাম্রাজ্যবাদ বৃহৎ বুর্জোয়া-সামন্ততন্ত্রবিরোধী বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের মূলভিত্তি, সুতরাং পূর্বের মত এই ঐক্য ধ্বংস করিতে এবং হিন্দু-মুসলমানের বিচ্ছেদ ঘটাইতে পারিলেই এই অভ্যুত্থান পরাজিত হইবে।

গান্ধী তাই হিন্দু-মুসলমান জনাসাধারণের এই মিলনকে "অপবিত্র মিলন" আখ্যা দিয়া ঘোষণা করিলেন ঃ

"যদি তাহাদের ঐক্য উপর হইতে নীচ পর্যন্ত গড়িয়া উঠিত তবে আমি এই মিলনের অর্থ বুঝিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা হইত ইতর প্রকৃতির মানুষের এক দঙ্গলের হাতে ভারতবর্ষকে সমর্পণ করার সমান। ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্যের সেই চরম পরিণতি প্রত্যক্ষ করিবার জন্য আমি ১২৫ বৎসর পর্যন্ত বাঁচিতে ইচ্ছা করি না।" [Harijan, 7th April, 1946]

গান্ধীর নিকট সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে হিন্দু-মুসলমানের মিলন হইল "অপবিত্র মিলন" এবং ইহাকে স্বীকার করা "ইতর প্রকৃতির মানুষের এক দঙ্গলের হাতে ভারতবর্ষকে সমর্পণ করিবার সমান।" (পৃঃ ৫০-৫১-৫২)

আমার জীবনই আমার বাণী ঃ

আমি আমার নিজের মুক্তিকে অন্য সব কিছুর চেয়ে, ভারতের মুক্তির চেয়েও বড় করে দেখি। তাই আমি সর্বপ্রথম হিন্দু, তারপর দেশপ্রেমিক।

শাসনকার্য চালনার জন্য প্রয়োজন হইলে গুলি চালনা, এমনকী হত্যাকাণ্ড অপরিহার্য এবং ইহাতে অহিংসার মূল নীতি লঙ্ঘন করা হয় না বা অহিংস নীতি ব্যর্থ হয় না।

মুসলমানদের হৃদয় জয় করিতে হইলে আত্মশুদ্ধির জন্য আমাদিগকে তপস্যা করিয়া যাইতে হইবে।

সংগ্রামের মাধ্যমে নহে, ভগবানের আশীর্বাদরূপেই এই স্বরাজ স্বর্গ হইতে ভারতের উপর নামিয়া আসিবে।

আমার উদ্দেশ্য হইল, ব্রিটিশ শাসনের এবং... সেই সঙ্গে ক্রমবর্ধমান অহিংস আন্দোলনকারীদের সংগঠিত সহিংস শক্তির বিরুদ্ধে সেই শক্তিকে (অহিংসাকে) পরিচালিত করা।

প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ জনসাধারণ ভারত শাসন করিতেছে না—রেলপথ, টেলিগ্রাফ-ব্যবস্থা, টেলিফোন-ব্যবস্থা এবং যে সকল উদ্ভাবন সভ্যতার জয়রূপে ঘোষিত হয়, তাহা দ্বারা বর্তমান সভ্যতাই ভারতকে শাসন করিতেছে।

আমার সেবার ফলে ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়া সমান মর্যাদা লাভ করিবে।

লন্ডনের রাজপ্রাসাদের উপর বোমা পড়িবে—একথা ভাবিতেও আমার কষ্ট হয়।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিরোধ না করার নীতির দরুন বল প্রয়োগ দেখা দিক এ যদি আমরা চাই, তবে যত শীঘ্র সম্ভব আমাদের পিছু হটা উচিত। ...শত্রুরা আমাদের কাপুরুষ বলুক, নিজের বিশ্বাসের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার চেয়ে বদনাম হওয়া ভাল।

আপনারা (জমিদাররা) নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন যে, শ্রেণীসংগ্রাম এড়াইবার জন্য আমি আমার সমস্ত শক্তি ও প্রভাব নিয়োগ করিব। যদি অন্যায়ভাবে কখনও আপনাদের সম্পত্তি কাড়িয়া লইবার চেষ্টা হয়, তবে আমি আপনাদের হইয়া সংগ্রাম করিব।

প্রতিপক্ষের আঘাত যতই তীব্র হউক না কেন, তাহাতে ক্ষিপ্ত হইয়া জনসাধারণের কিছুতেই বলপ্রয়োগ করা উচিত নয়। শাসকগোষ্ঠীর হৃদয় জয় করিয়াই তাহাদিগকে মুক্তি অর্জন করিতে হইবে।

মহাত্মার স্বীকারোক্তি

গান্ধীজি!

কী অদ্ভুত জাদু ছিল নামটির মধ্যে! আসমুদ্রহিমাচল উদ্বেলিত হয়ে উঠত এই একটি মাত্র নামে। স্বপ্ন দেখত প্রতিটি ভারতবাসী।

গান্ধীজিকে কেন্দ্র করে গোটা ভারত একদিন উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে নতুন দিনের নতুন স্বপ্নে। তিনিই জনজাগরণের প্রধান হোতা। ওঠো, জাগো। প্রিয় ভারতভূমির স্বাধীনতার কথা ভাবো। ব্রিটিশ আমাদের সেই স্বাধীনতা হরণ করেছে। ব্রিটিশের হাত থেকে মুক্ত করব আমরা আমাদের শৃঙ্খলিতো মাতৃভূমিকে। ভারতবর্ষ আমাদের জন্মভূমি, ব্রিটিশের নয়। বছরের পর বছর তারা আমাদের উপর অত্যাচার করে চলেছে। মুখ বুজে আমরা আর তা সহ্য করব না। প্রতিবাদ জানাব। ব্রিটিশকে ভারত ছেড়ে চলে যেতে বলব। তবে আমরা সশস্ত্র সংগ্রামে যাব না। হিংসাত্মক কার্যকলাপও করব না। অহিংসায় স্বাধীনতা আদায় করব ব্রিটিশের কাছ থেকে। গান্ধীজির আহ্বানে জেগে উঠল ঘুমন্ত ভারত।

কোটি কোটি ভারতবাসীর মনে সে কী আনন্দের জোয়ার! গান্ধীজি জিন্দাবাদ। বন্দেমাতরম্।

দেশের এখানে-ওখানে সর্বত্র শোনা যাচ্ছে গান্ধীজির কণ্ঠস্বর। আশ্চর্য জাদুভরা কণ্ঠস্বরে গোটা ভারত উল্লসিত মুগ্ধ অভিভূত।

এতদিনে ভারতবাসী পেয়েছে সত্যিকারের নেতার মতো নেতাকে। তাদের প্রিয় বাপুজিকে। বাপুজিই তাদের চেতনা জাগ্রত করেছেন। স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়েছেন। অহিংস সাধক অহিংসা দ্বারা স্বাধীনতা এনে দেবেন আমাদের। দিন আগত ওই।

নির্ব্যাজ নির্লোভী মানুষটির কথা তখন সবার মুখে মুখে। এমনকী ঘরে ঘরে তাঁর ছবিও। সত্যিই ভারতীয় আদর্শের মূর্ত প্রতীক গান্ধীজি।

ভারতবর্ষ গরিব দেশ। এখানকার অনেক মানুষই পেট ভরে খেতে পায় না। বেশির ভাগ লোকের ঠিকমতো পরিধেয় জোটে না। তিনি তো এই গরিব দেশেরই লোক। তাই সস্তার ঠেঙো খদ্দরের ধুতি আর উত্তরীয় গ্রহণ করলেন গান্ধীজি। খাবারও তাঁর যৎসামান্য।

দেশের স্বাধীনতা তাঁর একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান, স্বপ্ন-সাধনা। জনজাগরণ যখন এসেছে তখন স্বাধীনতা আসবেই। ব্রিটিশকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে স্বাধীনতা আনতেই হবে।

নতুন জোয়ারের কলতান তখন ভারতের সর্বত্র। গান্ধীজির ছত্রতলে চলে আসছে ভারতের অজস্র অসংখ্য মানুষ। চলে আসছে ভারতীয় নেতারা। চলে আসছে ব্যবসায়ী, রাজা, মহারাজা ও জমিদাররা।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বরণ করলেন ভারতের নেতা হিসেবে। সুভাষচন্দ্র বসু বললেন 'জাতির জনক'।

এই হলেন গান্ধীজি — জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী। এই হল তাঁর জীবনের একটা দিকের পরিচয়।

মুক্তিপথের অগ্রদূত মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী এই ভাবেই হয়ে ওঠেন কংগ্রেসের সর্বেসর্বা। ভারতের এক নম্বর নেতা। 'ফ্যাসিস্টদের মধ্যে মুসোলিনির, কমিউনিস্টদের মধ্যে স্ট্যালিনের আর নাৎসীদের মধ্যে হিটলারের যে স্থান, কংগ্রেসের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীরও ঠিক সেই স্থান।'

এর চাইতেও বড় কথা গান্ধীজি শুধু ভারতের এক নম্বর নেতা বা কংগ্রেসের সর্বেসর্বাই নন, অনেকের মতে তিনি একজন বিরাট সাধক। তাঁর মধ্যে কেউ কেউ আবার দেবত্বও আরোপ করেছে। অর্থাৎ, গান্ধীজি দেবতা। গগনচুম্বী তাঁর জনপ্রিয়তা। অসম্ভবকে সম্ভব করাই তাঁর জীবন-ধর্ম।

সত্যের পূজারী গান্ধীজিকে ভালো করে জানতে হলে একটু পেছনের দিকে চলে যেতে হবে। মানে তাঁর কিশোর ও যৌবন বয়সের কাছে। সেই সময়ে তাঁর কার্যকলাপ কেমন ছিল সেটা জানা দরকার। গান্ধীজির নিজের কাছ থেকেই শোনা যাক সেই কথা ঃ '....বন্ধুর সঙ্গ আমার জীবনের দুঃখদায়ক প্রসঙ্গ। এই সঙ্গ কয়েক বছর ধরিয়া চলিয়াছিল। তাহার সহিত এই বন্ধুত্ব, আমি সংশোধনের ইচ্ছার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই করিয়াছিলাম। এই বন্ধুর যে কতকগুলি দোষ ছিল তাহা আমি জানিতাম। আমার মা, দাদা ও আমার স্ত্রী — এই তিনজনের নিকটেই এই সঙ্গ তিক্ত লাগিত। পত্নীর সাবধান-বাণী গর্বান্ধ স্বামী হিসাবে গ্রাহ্য করার আবশ্যক আছে বলিয়া মনে করিতাম না। ....

যখন আমি এই বন্ধুর সঙ্গে মিশিতে লাগিলাম, তখন রাজকোটে

'সংস্কারপন্থী'দের যুগ। অনেক হিন্দু শিক্ষক লুকাইয়া মাংসাহার ও মদপ্যান করিতেন — এ সংবাদ এই বন্ধুর নিকট হইতে পাইলাম।........

অবশেষে মাংস খাওয়ার সেই নির্দিষ্ট দিনটি আসিল। আমার অবস্থার সম্পূর্ণ বর্ণনা করা কঠিন। একদিকে সংস্কার করার আগ্রহ, জীবনের পরিবর্তন করার নূতনত্বের মাদকতা, অপর দিকে চোরের মতো সৎকার্য করার লজ্জা — ইহাদের মধ্যে কোন ভাবনা প্রধান ছিল, তাহা আজ আর মনে নাই। আমরা নদীর ধারে নির্জন স্থান খুঁজিতে গেলাম। দূরে গিয়া, কেহ না দেখিতে পারে এমন কোণে প্রবেশ করিয়া, যাহা জীবনে কখনও দেখি নাই সেই বস্তু — মাংস দেখিলাম। সঙ্গে পাঁউরুটি ছিল। দুয়ের এক বস্তুও রুচিল না। মাংস চামড়ার মতো লাগে। খাওয়া অসম্ভব হইল।.....

আবার বিচার করি যে, আমার মাংসাহার তো করাই চাই, সাহস যেন না হারাই। বন্ধুটিও হার মানার পাত্র ছিল না। মাংস নানা রকম রান্না করিয়া সুন্দর রূপে সাজাইয়া দিত। নদীর তীরে না গিয়া কোনও বাবুর্চির সহিত ব্যবস্থা করিয়া ডাকবাংলোয় সুসজ্জিত টেবিল চেয়ারের প্রলোভনের মধ্যে সে আমাকে আনিয়া ফেলিল। ইহার ফলও ফলিল। রুটির উপর আমার বিতৃষ্ণা কমিল, ছাগলের জন্য মায়া অন্তর্হিত হইল এবং মাংসযুক্ত খাদ্যের স্বাদ পাইতে লাগিলাম।........

যেদিন এই খানা খাওয়া হইত সেদিন বাড়ি গিয়া আর খাইতাম না। মা খাইতে ডাকিতেন। তাঁহাকে বলিতাম — 'আজ ক্ষুধা নাই' — 'আজ হজম হয় নাই'। এই ধরনের নানা মিথ্যা কথা বলিতে হইত।.....

তবুও কিন্তু বন্ধুকে ছাড়িলাম না। ....তাহার সঙ্গ আমাকে ব্যভিচারীও করিত। কিন্তু ঈশ্বর যদি বাঁচাইতে চান, তবে পতনের ইচ্ছা থাকিলেও, লোক পবিত্র থাকিয়া যায়। বন্ধু আমাকে একদিন এক বেশ্যা-গৃহে লইয়া গেল। সমস্ত ব্যবস্থাই পূর্ব হইতে ঠিক করা ছিল। টাকাও দেওয়া হইয়া গিয়াছিল। আমি একেবারে পাপের মুখের ভিতর গিয়া পড়িলাম। কিন্তু ভগবানের অপার করুণা আমাকে রক্ষা করিল। সেই গৃহে আমি যেন অন্ধের মতো হইয়া গেলাম। আমার কথা বলার মতো শক্তিও ছিল না। লজ্জায় স্তব্ধ হইয়া সেই স্ত্রীলোকের পাশে খাটিয়ায় বসিয়া ছিলাম। স্ত্রীলোকটি ক্রুদ্ধ হইয়া

প্রথমে আমাকে দুই-চার কথা শুনাইল, তারপর আমাকে দরজা দিয়া বাহির করিয়া দিল।

তখন আমার পুরুষত্ব লাঞ্ছিত হইল বলিয়া মনে হইয়াছিল, পৃথিবী দ্বিধা হোক আমি তাহাতে প্রবেশ করি, লজ্জায় এমনি মনে হইতেছিল। কিন্তু আজ সেদিনকার উদ্ধার, ঈশ্বরের অপার কৃপা বলিয়া মনে করিতেছি। এই ধরনের ঘটনা আমার জীবনে আরও দুই-চারবার হইয়াছে। তাহাতেও বিনা চেষ্টায়, কেবল ঘটনার যোগাযোগবশত আমি বাঁচিয়া গিয়াছি। কিন্তু বিশুদ্ধ দৃষ্টিতেও এই ঘটনায় আমি পতিত হইয়াছি বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে। মনে মনে ভোগের ইচ্ছাই আমার ছিল।' (গান্ধী-রচনা সম্ভার ঃ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী — পৃ. ২৪-২৫-২৮-২৯)।

এ সব কথা গান্ধীজি নিজেই বলেছেন। এটা প্রথম শতবার্ষিকী সংস্করণ। এই কমিটিতে যাঁরা ছিলেন তাঁরা সবাই গান্ধীবাদী। দু-একজনের নাম উল্লেখ করছি। প্রফুল্লচন্দ্র সেন, অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, শঙ্করপ্রসাদ মিত্র প্রমুখ। অনুবাদের সময় মূল গ্রন্থের অনেক কিছু বাদ দেওয়া হয়েছে। কারণ, মূল গ্রন্থটি একসময় আমার হাতে এসেছিল। আমি পড়েও ছিলাম। এখন আমার কাছে সেই বইটি নেই। চেষ্টা করেও পাইনি। তাই এই অনুবাদ গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি। তবে মূল গ্রন্থের যতটা মনে আছে তারও কিছু উল্লেখ করব। তার আগে আমি গান্ধীজির নিজের কথা আবার বলি ঃ

'....... আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইত — যে কলহ হইত তাহার কারণও আমার এই বন্ধুটি। তাহার কথা শুনিয়া আমার ধর্মপত্নীকে আমি কত দুঃখই না দিয়াছি। এই অত্যাচারের জন্য আমি নিজেকে কখনও ক্ষমা করিতে পারি নাই। .... আমি আমার স্ত্রীকে যে দুঃখ দিয়াছি, তাহা কখনও বিস্মৃত হইতে পারিব না।' (গান্ধী-রচনা সম্ভার ঃ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী — পৃ. ৩০)।

বেশ্যা-বাড়ি যাওয়া, মিথ্যা কথা বলা, স্ত্রীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার মতো গান্ধী-চরিত্রে আরও একটা মারাত্মক দোষ আছে। বিড়ি খাওয়ার জন্য তিনি বাড়ির চাকরের পয়সা চুরি করতেন। নানা রকম অপকর্মের জন্য টাকা-পয়সা ধার করতেন। আর সেই দেনা মেটানোর জন্য গান্ধীজি নিজের ভাইয়ের সোনার তাগা কাটেন। এমনকী তিনি এত বেশি কামাসক্ত ছিলেন

যে গর্ভবতী স্ত্রীর সঙ্গেও নিয়মিত যৌন সুখভোগে লিপ্ত হতেন। এ সবের প্রমাণ পাওয়া যায় গান্ধীজির নিজের কথায়। তাঁর আত্মকথা থেকে আমি একের পর এক সব তুলে দিচ্ছি ঃ

'ওই সময়ের দাম্পত্য জীবনের কথা যখন স্মরণ করি, তখন আমার মূর্খতা ও কামনাসক্ত নিষ্ঠুরতার জন্য নিজেরই উপর ক্রোধ হয়। ...... আমার স্ত্রী গর্ভবতী হন। ...... ইন্দ্রিয়-ভোগের বাসনা আমার কর্তব্য-বুদ্ধিকেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল। তাই প্রতি রাত্রিতে যদিও আমি বাবার পা টিপিয়া দিতাম, তবু আমার মন শোওয়ার ঘরেই পড়িয়া থাকিত। .... রাত্রি সাড়ে দশটা কি এগারটা হইয়াছে। আমি অসুস্থ বাবার পা টিপিতেছি। কাকা বলিলেন — 'তুই যা, আমি বসিব।' আমি প্রসন্ন মনে সোজা শয়নকক্ষে গেলাম। স্ত্রী বেচারী ঘুমে বিভোর ছিল। কিন্তু আমি কেন ঘুমাইতে দিব? আমি তাহাকে জাগাইলাম। ..... আমার এই দ্বিগুণ লজ্জার কথা শেষ করিবার পূর্বে ইহাও বলিয়া রাখি যে, আমার পত্নীর যে পুত্র হইয়াছিল সে দুই-চার দিন নিশ্বাস লইয়াই চলিয়া গিয়াছিল।' (গান্ধী-রচনা সম্ভার ঃ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী — পৃ. ৩০-৩৪-৩৫-৩৬-৩৭)।

এ বার আসি চুরির প্রসঙ্গে ঃ

'এক আত্মীয় ও আমার বিড়ি খাওয়ার শখ হয়। বিড়ি খাওয়ায় যে কিছু লাভ আছে, অথবা বিড়ির গন্ধ যে ভালো লাগে, এমন বোধ আমাদের দু'জনের কাহারও ছিল না। মুখ হইতে ধোঁয়া ছাড়ার মধ্যে কী একটা মজা আছে, রস আছে — এইরূপ বোধ হইত। আমার কাকা বিড়ি খাইতেন। ...... কাকা বিড়ি খাওয়ার শেষে যেটুকু অংশ ফেলিয়া দিতেন তাহাই খাইতে আরম্ভ করিলাম।

কিন্তু ওই রকম বিড়ির টুকরা সব সময় পাওয়া যায় না, আর তাহা হইতে বেশি ধোঁয়াও বাহির হয় না। চাকরের কাছে দু'চারটা পয়সা থাকিত, তাহা হইতেই মধ্যে মধ্যে এক-আধটা চুরি করার অভ্যাস হইল ও সেই পয়সায় বিড়ি খরিদ করিতে লাগিলাম। ....

বিড়ির টুকরা চুরি করা এবং সে জন্য চাকরের পয়সা চুরি করা অপেক্ষাও আর এক চুরির দোষ গুরুতর বলিয়া মনে করি। .... ব্যাপারটা ছিল — আমার সেই মাংসাহারী ভাইয়ের সোনার তাগার টুকরা কাটিয়া

লওয়া। সে টাকা পঁচিশের মতো ছোটখাটো ধার করিয়া ফেলিয়াছিল। ইহা কেমন করিয়া শোধ দেওয়া যায় তাহাই আমরা দুই জনে যুক্তি করিতেছিলাম। আমার ভাইয়ের হাতে সোনার নিরেট তাগা ছিল। তাহা হইতে এক তোলা সোনা কাটিয়া লওয়া কিন্তু কঠিন হইল না। তাগা কাটিলাম। কর্জও শোধ হইল।' (গান্ধীরচনা সম্ভার ঃ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী — পৃ. ৩১-৩২)।

এই ধরনের নানা কু-কর্ম করে গান্ধীজি অনুতপ্ত হয়ে মনে মনে প্রতিজ্ঞাও করতেন তিনি এ সব থেকে দূরে থাকবেন। কিন্তু থাকতে পারেননি। আবার লিপ্ত হয়েছেন। এই কামাসক্ত দুর্বলচিত্ত গান্ধীকেই তাঁর যৌবনকালে আমরা বারবার দেখতে পাই। একাধিক বার পতিতালয়ে গেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর নিজের কথা আগেই বলেছি। 'এই ধরনের ঘটনা আমার জীবনে আরও দুই-চারবার হইয়াছে।'

গান্ধীজি দৃঢ়চেতা হলে তাঁকে বারবার কলুষিত জীবন যাপন করতে হত না। এ বার তাঁর জীবনের একটা অদ্ভুত ঘটনার কথা উল্লেখ করি ঃ

'পোর্টসমাউথকে খালাসিদিগের বন্দর বলা হয়। সেখানে অনেক দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের বাস। এই স্ত্রীলোকেরা ঠিক বেশ্যা নয়, আবার নির্দোষও নয়। এই রকম এক বাড়িতে আমাদিগকে উঠিতে হইয়াছিল। অভ্যর্থনা সমিতি ইচ্ছা করিয়া যে এই প্রকার বাড়ি ঠিক করিয়াছিলেন, এ কথা বলা যায় না। পোর্টসমাউথের মতো বন্দরে কোনও যাত্রীকে রাখার জন্য কোনও ঘর ঠিক করিলে, কোনটা যে ভালো আর কোনটা যে খারাপ বাড়ি তাহা নির্ণয় করা শক্ত।

রাত্রি হইল। আমরা সভা হইতে বাড়ি ফিরিলাম। খাওয়ার পর তাস খেলা আরম্ভ হইল। বিলাতে ভালো ঘরেও অভ্যাগতের সহিত গৃহিনী তাস খেলিতে বসিয়া থাকেন। এই তাস খেলা নির্দোষ আমোদের সহিতই হয়। এখানে কিন্তু বীভৎস আমোদ আরম্ভ হইল। আমার সঙ্গী যে উহাতে নিপুণ তাহা জানিতাম না। আমি এই কৌতুকে রস অনুভব করিলাম। আমি কু-বাক্য হইতে কু-কার্যে অবতীর্ণ হইতে উদ্যত হইয়াছিলাম। তাস ফেলিয়া উঠিতে উদ্যত হইয়াছি, এমন সময় আমার হিতকারী সঙ্গীর মধ্যে যে রামচন্দ্র

বাস করিতেছিলেন, তিনি বলিয়া উঠিলেন — 'বাঃ রে ছোকরা! তোমার মধ্যেও শয়তান আছে দেখিতেছি।'

আমি লজ্জিত হইলাম — সাবধান হইলাম। ...... মায়ের নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম তাহা স্মরণ হইল। আমি পলাইলাম। ....

পরস্ত্রী দেখিয়া বিকারগ্রস্ত হওয়া ও তাহার সহিত বাসনা চরিতার্থ করিবার ইচ্ছা এই আমার প্রথম বলিয়া মনে হয়।' (গান্ধী-রচনা সম্ভার ঃ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী — পৃ. ৮০)

সত্যের পূজারী গান্ধীজির আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ না করে পারছি না। তাঁর নিজের মুখ থেকেই শোনা যাক সেই কথা ঃ

'বিলাতে বাল্য-বিবাহ বলিয়া কোন বস্তু নাই। সেই জন্য সেখানে ভারতীয় যুবকেরা নিজেরা বিবাহিত — একথা স্বীকার করিতে লজ্জা পায়। বিবাহ গোপন করার আর একটা কারণ এই যে, সেকথা প্রকাশ হইলে যে পরিবারে থাকিতে পারা যায় সে পরিবারের যুবতী কুমারীদের সহিত মেলামেশা ও ঘনিষ্ঠতা করা চলে না। এই ঘনিষ্ঠতা বেশির ভাগই নির্দোষ। পিতা-মাতাও ঐ প্রকার মেলামেশা প্রশ্রয় দেন। যুবক ও যুবতীর মতো এই রকম একত্র বাস সে-সমাজে আবশ্যক বলিয়া গণ্য, কেননা সেখানে প্রত্যেক যুবককে নিজের সহধর্মিণী খুঁজিয়া লইতে হয়। সেই হেতু সে সম্বন্ধ বিলাতে স্বাভাবিক, ভারতীয় যুবক বিলাতে গিয়া যদি সেই সম্বন্ধের বন্ধনে বাধা পড়ে তবে পরিণাম ভয়ঙ্কর হয়। এইরূপ পরিণাম কতবার হইয়াছে বলিয়াও জানা গিয়াছে। এই মোহিনী মায়ার ফাঁদে আমাদের যুবকেরা পড়ে দেখিয়াছি। বিলাতে যুবকদের পক্ষে নির্দোষ হইলেও, আমাদের পক্ষে ঐরূপ মেলামেশা ত্যাজ্য। এই সখ্যের খাতিরে তাহারা অসত্যাচরণ করিতেও দ্বিধা করে না। এই জালে আমিও জড়াইয়াছিলাম। আমি পাঁচ-ছয় বছর পূর্বে পরিণীত হইলেও, এক পুত্রের পিতা হইলেও, অবিবাহিত বলিয়া নিজের পরিচয় দিতে দ্বিধা করি নাই।' (গান্ধী-রচনা সম্ভার ঃ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী — পৃ. ৭১-৭২)।

এই হলেন গান্ধীজি। এটাও তাঁর জীবনের আরেকটা দিকের পরিচয়। এই পরিচয়টা গান্ধীবাদীরা চাপার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু চেষ্টা করলেই কি তা সম্ভব? না, সম্ভব নয়। কারণ, গান্ধীর এই আত্মজীবনী হাজার হাজার

কপি বিক্রি হয়েছে। চারদিকে ছড়িয়ে গেছে এই সব কথা। সুতরাং, এটা প্রকাশ না-করলে সত্যের অপলাপ হয়। তাই গান্ধীবাদীরা গান্ধীজির ভাবমূর্তি রক্ষার জন্য সুকৌশলে বইটি সম্পাদনা করেছেন। এটা পরিষ্কার যে গান্ধীজির কৈশোর ও যৌবনের এই অংশটা একেবারে মসীকৃষ্ণ অন্ধকারে ঢাকা। চরম উচ্ছৃঙ্খল এই লোকটি ওই সময় একের পর এক অন্যায় করেছেন। পরবর্তীকালেও আমরা গান্ধীজির এই স্বভাবটা দেখতে পাই।

রাজনীতিতে নেমে তিনি অনেক নেতার সঙ্গেও অনেক অন্যায় আচরণ করেছেন। তাঁর এই সব নোংরা কাজের জন্য তিনি আবোল-তাবোল যুক্তির অবতারণা করেছেন। কখনও অহিংসার দোহাই দিয়েছেন, কখনও আবার অন্তরাত্মার নির্দেশ বলেছেন। আসলে গান্ধীজি খুবই চতুর। এই দ্বিচারিতা বিদ্যাটা তিনি ছেলেবেলাতেই অর্জন করেছেন। যার ফলে একমাত্র সুভাষচন্দ্র বসু ছাড়া বাকি সব নেতাই তাঁর পোষ মেনেছিল। পরে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনায় আসছি। তার আগে গান্ধীজির যৌবনের কলুষিত জীবনের আরও কিছু কথা বলব।

মৃত্যু-শয্যায় গান্ধীজির পিতা কাবা গান্ধী। সেই ভয়ঙ্কর রাত্রি। গোটা বাড়ি থমথমে। এই অবস্থার মধ্যেও গর্ভবতী স্ত্রীর সঙ্গে যখন তিনি যৌনসুখে লিপ্ত হন, হঠাৎই তখন বাড়ির চাকর এসে জানাল দুঃসংবাদটা — বড়বাবু আর নেই।

গান্ধীজি যে কত বড় কামুক —এটাই তার প্রমাণ।

যৌবনে যত রকম নোংরা দিকে মানুষের ঝোঁক থাকে তার সবই গান্ধীজির মধ্যে ছিল।

তিনি পতিতালয়ে গেছেন, স্ত্রীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন, পরস্ত্রীর সঙ্গে যৌনসুখ ভোগের জন্য হিতাহিত জ্ঞান হারিয়েছেন, মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন, জুয়া খেলেছেন, টাকা-পয়সা, সোনাদানা চুরি করেছেন — এককথায় সব রকম কু-কর্মের সঙ্গেই তিনি জড়িত হয়েছিলেন। বৈষ্ণব হয়েও তিনি বহুবার মাংস খেয়েছেন। কোনও অপকর্ম করতেই বাকি রাখেননি। কোনও বখাটে ছেলেও এতগুলি কু-কাজ করে কিনা সন্দেহ!

অনেক দিন আগের কথা। আজও আমার পরিষ্কার মনে আছে। আমার এক কাকার ঘরে গান্ধীজির একখানা বাঁধানো মস্তবড় ফটো দেখেছিলাম।

কতই বা বয়স আমার তখন। বড়জোর ছয়-সাত বছর। একেবারে ছেলেমানুষ। কাকিমাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কার ছবি এটা?

কাকিমা বললেন, জানিস না?

— না।

— উনি গান্ধীজি।

— ওঃ। বলে আমি চুপ করে গেলাম।

কাকিমা বললেন, জানিস তো উনি হচ্ছেন দেবতা।

কাকিমার মতো অনেকেই গান্ধীজির মধ্যে দেবত্ব আরোপ করেছিলেন। ফলে ছেলেবেলায় আমিও গান্ধীজিকে দেবতা ভাবতাম। অনেক পরে তাঁর জীবনী পড়ে চোখ খুলল। বুঝলাম ইনি একজন চতুর রাজনীতিক। আমার ধারণা, এ রকম সুচতুর রাজনৈতিক নেতা আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষে জন্মায়নি।

গান্ধীজি ছিলেন বহুরূপী। কখনও তিনি হতে চেয়েছেন ভারতের এক নম্বর নেতা, কখনও মহাপুরুষ — কখনও আবার মহাত্মা। আসলে তিনি যে কী ছিলেন বা কী হতে চেয়েছিলেন বোঝা মুশকিল। তাঁর কাছে হিন্দু-মুসলিম সব সমান। কিন্তু 'ঈশ্বর-আল্লা তেরে নাম'-এর স্রষ্টা-সাধকের পুত্র মুসলিম কন্যার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার জন্য তিনি সব সম্পর্ক ছিন্ন করেন আপন সন্তানের সঙ্গে। তাই মুসলিম সমাজও সরে গেল গান্ধীজির কাছ থেকে অনেক, অনেক দূরে। তারা বুঝল গান্ধীজির মুখ আর মন এক নয়।

সত্যি তাই। পরবর্তীকালে গান্ধীজির এই চরিত্রই আমরা বারবার দেখেছি। তাঁরই জন্য ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বহু আন্দোলন ভেস্তে গেছে। তা না হলে ভারত হয়তো অনেক আগেই স্বাধীন হয়ে যেত।

গান্ধীজি অহিংস সাধক। অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী। সারা পৃথিবী জানে তাঁর এই পরিচয়।

কিন্তু সত্যি কি তাই? আমি একটার পর একটা ঘটনার অবতারণা করে প্রমাণ করব গান্ধীজি অহিংস ছিলেন না। তিনি ছিলেন সুবিধাবাদী। যখন যেদিকে পাল্লা ভারী তিনি তখন সেইদিকেই যেতেন।

হিন্দুস্থানের হিটলার

অহিংসা! অহিংসা! অহিংসা! রাজনীতিতে যোগদান করে প্রথমেই তিনি গোটা বিশ্বকে শোনালেন শান্তির এই ললিত বাণী। হিংসায় ক্ষয়, অহিংসায় জয়। তাই হিংসা নয়, চাই অহিংসা। অহিংসাকে মূলমন্ত্র করে রাজনীতির মঞ্চে আবির্ভূত হলেন তিনি।

বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ মুগ্ধ অভিভূত। সবার মুখে একই কথা— ঈর্ষা-দ্বেষে ভরা পৃথিবীর বুকে কে ছড়াতে এসেছে অহিংসার ফুল? কে এই অসাধারণ মানুষটি?

গান্ধীজি। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। সত্যের পূজারী অহিংস সাধক গান্ধী। অহিংসাই তাঁর জীবন-ধর্ম। তিনিই ভারতীয় আদর্শের মূর্ত প্রতীক। প্রায় সারা দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষ জানে গান্ধীজির এই পরিচয়।

সত্যি কি তাই? সত্যিই কি গান্ধীজি অহিংস সাধক? না। তাঁর নিজের কথা বলছি। ১৯২০ সালে নাগপুর কংগ্রেসে তিনি বলেছিলেন, 'ভারতের হাতে যদি তরবারি থাকত, তবে সেই তরবারি হাতে নিয়েই সে যুদ্ধে অবতীর্ণ হত।' এবং তিনি শয়তান ব্রিটিশ সরকারকে তরবারি দিয়েই শায়েস্তা করতেন।

এটা কি অহিংস সাধকের কথা?

আসলে গান্ধীজির বক্তব্য — অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত শক্তিশালী ব্রিটিশের সঙ্গে অস্ত্রহীন দুর্বল ভারতবাসীর যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া মানে মৃত্যুর শামিল। পরাজয় অনিবার্য। তাই দুর্বল বলেই তিনি অহিংস হয়েছেন, সবল হলে হতেন না। গান্ধীজির এই উক্তি প্রমাণ করে অক্ষমতাই তাঁকে অহিংস হতে বাধ্য করেছে।

১৯৩৯ সাল। ত্রিপুরি কংগ্রেস। গান্ধীজির জীবনের অন্যতম কলঙ্কময় অধ্যায় এই ত্রিপুরি কংগ্রেস। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে তিন জনের নাম উঠল সভাপতি নির্বাচনে। আবুল কালাম আজাদ, সুভাষচন্দ্র বসু, পট্টভি সীতারামাইয়া।

হঠাৎ অজ্ঞাত কারণে সরে দাঁড়ালেন আজাদ। সরলেন না সুভাষ। আর পট্টভি সীতারামাইয়ার সরে দাঁড়ানোর প্রশ্নই ওঠে না। কারণ, তিনি

কংগ্রেসের সর্বেসর্বা মহাত্মা গান্ধীর মনোনীত প্রার্থী। তাঁর কথাই আলাদা। তা ছাড়া গান্ধী মনোনীত প্রার্থীকে হারানো অত সহজ নয়। কিন্তু ফল হল উল্টো। ভোট-যুদ্ধে জয়ী হলেন সুভাষ। ধরাশায়ী গান্ধীজির প্রার্থী পট্টভি সীতারামাইয়া। সুভাষ পেয়েছেন ১৫৭৫ ভোট। আর পট্টভি পেয়েছেন মাত্র ১৩৪৬।

গান্ধীজি ও তাঁর প্রিয় শিষ্যদের চোখের সামনে তখন অশনি-সংকেত। এ যে সাংঘাতিক কথা! এখন উপায়?

সুচতুর গান্ধীজি তো চিরকালই অহিংসার মুখোশ পরে নানা অপকর্ম করেছেন। এ বারও তার ব্যতিক্রম হল না। অনেক ভেবেচিন্তে তিনি যে মন্তব্যটি করলেন তা শুনে বলতে গেলে প্রায় গোটা ভারত বিস্ময়ে হতবাক। এ কোন্ গান্ধী? অহিংসার পূজারী মহাত্মা গান্ধী না হিংসায় জর্জরিত কূট গান্ধী!

এ বার উল্লেখ করছি গান্ধীজির সেই মারাত্মক জঘন্য উক্তিটি ঃ 'The defeat of Pattabhi Sitaramyya is my defeat.' — অর্থাৎ সীতারামাইয়ার পরাজয় মানে আমার পরাজয়।

কেন অহিংস মন্ত্রের ঋষি মহাত্মা গান্ধী এই মন্তব্য করলেন? সুভাষ নির্বাচনের মাধ্যমে জয়ী হয়েছেন। গণতন্ত্রে নির্বাচনই তো শেষ কথা। আর নির্বাচনে জয়-পরাজয় থাকবেই। তাই বলে মহাত্মার মতো মানুষ এত বড় নির্মম উক্তিটা করলেন কী করে? এই উক্তির পেছনে যে উদ্দেশ্য ছিল, সে কথায় আমি পরে আসছি। তার আগে যাঁকে কেন্দ্র করে এই উক্তিটি সেই পট্টভি সীতারামাইয়ার কথা শোনা যাক। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর 'কংগ্রেসের ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

'সুভাষের দ্বিতীয়বার সভাপতি হবার প্রশ্নকে গান্ধীজি এতখানি দোষের মনে করলেন কেন? নির্বাচনের পরেও গান্ধীজির মনোভাবের যে কোনও পরিবর্তন ঘটেনি, তা স্পষ্টভাবেই স্বীকার করা হয়েছিল। ..... সুভাষ সম্বন্ধে গান্ধীজির এই ধরনের আচরণের আসল উদ্দেশ্য কী ছিল, তা বলতে পারেন একমাত্র গান্ধীজিই।'

আমরাও বলতে পারি বইকী! সুভাষের জয়ের পর গান্ধীজি তাঁর একনম্বর নেতৃত্ব নিয়ে ভীত হয়ে পড়েছিলেন। কারণ, কংগ্রেসের সব রথী-

মহারথী একদিকে, যুব-সম্প্রদায়কে সঙ্গে নিয়ে সুভাষ একা একদিকে। তবুও নির্বাচনে জয়ী হলেন সুভাষ, পরাজিত গান্ধীজির প্রার্থী। মানে গান্ধীজি স্বয়ং এবং গান্ধীবাদীরা।

এ যে অবিশ্বাস্য! অকল্পনীয়! স্বপ্নেরও অগোচর!

সে দিন সুভাষের বিরুদ্ধে পট্টভিকে সমর্থন করেছিলেন জওহরলাল নেহরু, আবুল কালাম আজাদ, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, গোবিন্দবল্লভ পন্থ, শেঠ গোবিন্দ দাস, আচার্য জে বি কৃপালনি, ভুলাভাই দেশাই, পুরুষোত্তম দাস ট্যান্ডন, রাজাগোপাল আচারিয়া প্রমুখ কংগ্রেসের তাবড়-তাবড় বিখ্যাত সব নেতা।

তবুও পরাজয়। এ যে সাংঘাতিক ব্যাপার! এর পরেও কি সুভাষকে কংগ্রেসে রাখা সমীচীন? না। আদৌ না। সুভাষ কংগ্রেসে থাকলে গোটা কংগ্রেসটাই চলে যাবে তাঁর হাতে। গান্ধীজির একনম্বর নেতৃত্ব তখন শেষ। শেষ পেছন থেকে তাঁর কলকাঠি নাড়ানোর কৌশল। কারণ, সুভাষের জনপ্রিয়তা তখন প্রমাণিত, প্রতিষ্ঠিত। ত্রিপুরি কংগ্রেসের নির্বাচনই তা প্রমাণ করেছে। সুভাষকে আর কংগ্রেসে রাখা উচিত নয়। সুতরাং, বহিষ্কার করো কংগ্রেস থেকে।

তাই হল। সুভাষ কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত। গান্ধীজি নিশ্চিন্ত হলেন। কংগ্রেসের বাকি নেতারা তাঁর পোষ মানে। তাঁরা ক্ষমতালোভী। তাঁদের নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ নেই। ভয় সুভাষকে। কেননা, তিনি ক্ষমতালোভী নন।

কিন্তু নির্বাচিত সভাপতিকে এইভাবে বহিষ্কার করা কি যায়, না করা উচিত?

গান্ধীজি ওই সব নিয়ম-কানুনের ধার ধারেন না। মুখে প্রকাশ না করলেও মনে মনে তিনি জানেন একনম্বর নেতৃত্ব হাতছাড়া হলে আর রইলটা কী! কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতারা তাঁর কথায় ওঠে-বসে। বাগে এল না শুধু অবাধ্য সুভাষ। সুতরাং, হটাও তাঁকে।

গান্ধী-চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হল নিজের স্বার্থে আঘাত লাগলেই তিনি অহিংসার বুলি আওড়াতেন। কংগ্রেসের ক্ষমতালোভী নেতারা তাঁর কথায় সায় দিতেন। যিনি দেবেন না, তিনি শেষ।

কংগ্রেসকে গান্ধীজি নিজের সম্পত্তি করে তুলেছিলেন। তাই তাঁর নির্দেশেই ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে হবে। তাঁর নির্দেশেই সভাপতি ঠিক হবে। এককথায় তিনি যা চাইবেন, তা-ই হবে। আজও নেহরু-গান্ধী পরিবার একইভাবে চলছে।

কংগ্রেসের অধিবেশন শেষে সভাপতিকে বিদায় দেওয়াই রীতি। কিন্তু সভাপতি সুভাষকে বিদায় দেবার সময় দেখা গেল চরম নোংরামি। 'কংগ্রেসের ইতিহাস'-এ তা লেখা আছে ঃ

'বরাবরই সভাপতিকে বেশ ঘটা করে জাঁকজমক সহকারে বিদায় দেওয়া হয়। ত্রিপুরিতে তার ব্যতিক্রম দেখা গেল। বিদায় কালে সুভাষের কাছে ছিলেন তাঁর পরিবারের লোকজন, দু'জন ডাক্তার আর ওয়ার্কিং কমিটির দু'জন সদস্য মাত্র।' (কংগ্রেসের ইতিহাস ঃ ড. পট্টভি সীতারামাইয়া — ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৪)।

এই হল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি। গান্ধীজির মনোনীত কমিটি। সভাপতির বিদায়ের সময়ও সামান্যতম শিষ্টাচার প্রদর্শন করারও প্রয়োজন মনে করেনি। সব কিছুই তো হয়েছে গান্ধীজির নির্দেশে। পরাজিত গান্ধীজি তখন হিংসার অনলে জ্বলেই এই নির্দেশ দিয়েছিলেন।

কংগ্রেসের তিনি সর্বেসর্বা। কংগ্রেসে তাঁর কথাই শেষ কথা। এটাই শেঠ গোবিন্দ দাস স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন ঃ 'ফ্যাসিস্টদের মধ্যে মুসোলিনীর, নাৎসিদের মধ্যে হিটলারের আর কমিউনিস্টদের মধ্যে স্ট্যালিনের যে স্থান, কংগ্রেসের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীরও সেই স্থান। কংগ্রেসের লিখিত গঠনতন্ত্রে তাঁহার জন্য কোনও স্থান নির্দিষ্ট নাই ইহা সত্য, কিন্তু ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না, রাষ্ট্রপতি পদে মহাত্মা গান্ধীর মনোনীত ব্যক্তিকে নির্বাচন করা এবং রাষ্ট্রপতির পক্ষে ওয়ার্কিং কমিটির অধিকাংশ সদস্যপদে মহাত্মা গান্ধীর মনোনীত ব্যক্তিগণকে মনোনীত করা একটা প্রথায় দাঁড়াইয়াছে।' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১ মার্চ, ১৯৩৯ সাল)।

গান্ধীবাদীদের তখন সে কী উল্লাস! তাঁরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে জয়ধ্বনি দিলেন, 'হিন্দুস্থানকা হিটলার কী জয়। মহাত্মা গান্ধীজি কী জয়।'

চমৎকার! চমৎকার বিশেষণ! গান্ধীজি হিন্দুস্থানকা হিটলার! সহিংস হিটলারের সঙ্গে অহিংস গান্ধীর তুলনা! প্রতিবাদের ঝড় ওঠার কথা। কিন্তু

কোনও প্রতিবাদ এল না গান্ধীবাদীদের কাছ থেকে। স্বয়ং গান্ধীজিও কোনও প্রতিবাদ করলেন না। কেন করবেন? জার্মানিতে তখন হিটলারের জয়জয়কার। সারা পৃথিবী জুড়ে তাঁর নাম। হিটলারের সঙ্গে তুলনা মানে তো বিরাট সম্মান! হোক না সে সহিংস।

এই হলেন গান্ধীজি। এই হলেন তাঁর শিষ্যরা! এই হল তাঁর নীতি! এ প্রসঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বললেন ঃ '....... অবশেষে আজ, এমনকী, কংগ্রেসের মঞ্চ থেকেও হিটলারী নীতির জয়ধ্বনি শোনা গেল। স্বাধীনতার মন্ত্র উচ্চারণ করবার জন্য যে বেদী উৎসৃষ্ট, সেই বেদীতেই ফ্যাসিস্টের সাপ ফোঁস করে উঠেছে। ...... ভিতরে ভিতরে কংগ্রেসের মন্দিরে এই যে শক্তিপূজার বেদী গড়ে উঠেছে তার কি স্পর্ধিত প্রমাণ এবারে পাইনি — যখন মহাত্মাজীকে তাঁর ভক্তেরা মুসোলিনী ও হিটলারের সমকক্ষ বলে বিশ্বসমক্ষে অসম্মানিত করতে পারলেন?'

১৯৩৯ সাল। নির্বাচিত সভাপতি সুভাষকে সহিংস বলে তিনি কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করলেন। আর এই একই বছরে তাঁর প্রিয় শিষ্যরা তাঁদের অহিংস বাপুজির সঙ্গে তুলনা করলেন সহিংস যুদ্ধবাজ অত্যাচারী হিটলারের। তাতে বাপুজি কিন্তু অসন্তুষ্ট নন। বরং খুশি। হাজার হোক হিটলার বলে কথা। এই ভাবে অহিংসার মুখোশ পরে তিনি চলেছেন দিনের পর দিন।

সুভাষ যখন কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত, তখন জাতীয় স্বার্থের কথা ভেবে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তার করেছিলেন গান্ধীজিকে। তারিখটা ছিল ২০ ডিসেম্বর, ১৯৩৯। সেখানে কবিগুরুর বক্তব্য ছিল ঃ 'Owing gravely critical situation all over India and especially in Bengal would urge Congress Working Committee immediately remove ban against Subhas and invite his cordial co-operation in supreme interest national unity.'

সুচতুর গান্ধীজি বিশ্বকবির অনুরোধে কর্ণপাত করলেন না। করা মানেই তো বিপদ। নির্বাচনে সুভাষের জয় প্রমাণ করেছে গান্ধীজির চাইতেও তাঁর জনপ্রিয়তা তখন অনেক বেশি। তাই কেন তিনি রবীন্দ্রনাথের কথা রাখতে গিয়ে নিজের অস্তিত্ব বিপন্ন করবেন? অর্থাৎ, খাল কেটে কুমির আনবেন।

সুতরাং, না। কোনওভাবেই তিনি সুভাষকে কংগ্রেসে নেবেন না। ২২ ডিসেম্বর জানিয়ে দিলেন তিনি সে কথা ঃ 'Your wire considered by Working Committee. With knowledge they have they are unable to lift ban. My personal opinion is you should advise Subhasbabu submit discipline if ban is to be removed. Hope you are well.'

অদ্ভুত কথা! সত্যি অদ্ভুত!

যে সুভাষ নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে নির্বাচনে জয়ী হলেন, তিনি হলেন শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী! আর যে গান্ধী খেয়াল খুশিমতো কংগ্রেসে যা ইচ্ছে তাই করছেন, তিনি হলেন নিয়মরক্ষক শৃঙ্খলাপরায়ণ। এমনকী তিনি সুভাষ সম্বন্ধে বাজে মন্তব্যও তখন করলেন ঃ 'I feel that Subhas is behaving like a spoilt child.'

এ তো চোরের মায়ের বড়ো গলা। আমার তো মনে হয় সে দিন গান্ধীজিকেই কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করা উচিত ছিল সর্বাগ্রে। কংগ্রেস সর্বভারতীয় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের মস্তবড় হাতিয়ার। সেই দলটি যেন গান্ধীজির হাতের পুতুল। নানারকম বিশৃঙ্খলা তিনি সৃষ্টি করছেন সেই দলের মধ্যে। ফলে প্রচুর ক্ষতি হয়েছে স্বাধীনতা আন্দোলনের। তাই অহংসর্বস্ব গান্ধীজি সম্বন্ধে ভারতের একজন ইংরেজ বন্ধু এডওয়ার্ড টমসন মন্তব্য করেছিলেন ঃ 'গোল টেবিল বৈঠকের আগে গান্ধীজির কোনও ত্রুটি আমার নজরে পড়েনি। এ বার পড়ল। গান্ধীজি শুধু অহংসর্বস্ব নন, অসংলগ্নও বটে। উনি ইংল্যাণ্ডে না এলেই ভালো করতেন।'

কথাটা ষোলোআনাই সত্যি। তার প্রমাণ আমি তুলে ধরছি।

লর্ড মাউন্টব্যাটেন দেশভাগের প্রস্তাব দিলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে। সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন প্যাটেল। হ্যাঁ, আমার কোনও আপত্তি নেই। 'It must be placed on record that the man in India, who first fell for Lord Mountbatten's idea was Sarder Pattel.

As soon Sardar Patel had been convinced, Lord Mountbatten turned his attention to Jawharlal.'

[India wins Freedom : Moulana Abul Kalam Azad– P-183].

জওহরলালও রাজি। এ বার মাউন্টব্যাটেন বললেন, আসল লোকটির মত জানা দরকার। তাঁর মত না থাকলে অনেক অসুবিধে হতে পারে। কে জানে, কে বলতে পারে গান্ধীজি এই নিয়ে আবার আন্দোলন শুরু করবেন কিনা।

— না, করবেন না। মাউন্টব্যাটেনকে আশ্বাস দিলেন প্যাটেল, 'Gandhi would abide loyally by any decision.' আমরা যে সিদ্ধান্তই নিই না কেন, গান্ধীজি নিষ্ঠার সঙ্গে তার প্রতি আনুগত্য রক্ষা করে চলবেন।

অদ্ভুত কথা! সত্যি অদ্ভুত!

কোন সাহসে প্যাটেল এতবড় কথাটা বললেন। এটা তো ছেলেখেলা নয়। একটা অখণ্ড দেশকে দ্বিখণ্ড করার ব্যাপার। আর সেই ব্যাপারে তাঁর এই সাংঘাতিক উক্তি! নিশ্চয়ই এর পেছনে কারণ আছে। হয়তো ইতিপূর্বে গোপনে গান্ধীজি সে রকম কোনও ইঙ্গিত দিয়েছেন। সন্ধান করে দেখা যাক সেই ধরনের কোনও ঘটনা ঘটেছিল কিনা। প্যাটেলের ওই উক্তি শুনে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন আজাদ। ছুটে গেলেন গান্ধীজির কাছে।

— শুনেছেন তো বাপুজি সর্দার প্যাটেলের কথা। দেশ-বিভাগের ব্যাপারে মাউন্টব্যাটেনকে তাঁর সম্মতি জানিয়েছেন। জওহরলালও প্যাটেলের সঙ্গে একমত। তিনিও ওই পথেই পা বাড়িয়েছেন। এখন আপনি ছাড়া আমাদের গতি নেই। আপনি যদি দেশ-বিভাগের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান, তাহলে এখনও আমরা এটাকে বন্ধ করতে পারি।

গান্ধীজি কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, দেশ-বিভাগ যদি হয়, তা হবে আমার মৃতদেহের উপর দিয়ে। আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি, ততক্ষণ কিছুতেই দেশ-বিভাগে সম্মতি দেব না। গান্ধীজির নিজের ভাষায় ঃ 'India could only be partitioned over my dead body alone. So long as I am alive, I will never agree to the partition of India.'

তিনি আরও বললেন, এ কথা যেন না বলা হয় ভারত-বিভাগে গান্ধীর সম্মতি ছিল। আজ সবাই স্বাধীনতার জন্য ধৈর্য হারিয়েছে। কংগ্রেস দেশ-বিভাগ প্রস্তাব মেনে নিয়েছে। এই প্রস্তাবে তাদের হাতে একটি করে কাঠের রুটি দেওয়া হয়েছে। খেলে পেটের যন্ত্রণায় মারা যাবে। না খেলে অনাহারে মরতে হবে।

আমরা হয়তো এই মুহূর্তে এর ভয়াবহ পরিণতি বুঝতে পারছি না। কিন্তু আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি যে এইভাবে স্বাধীনতা পেলে তার ভবিষ্যৎ হবে অন্ধকার। ঈশ্বর যেন আমাকে এটা দেখার জন্য বাঁচিয়ে না রাখেন।

'Let it not be said Gandhi was a party to Indian vivisection. But everyone to-day is impatient for independence. Congress practically decided to accept partition. They have handed an wooden loaf in this new plan. If they eat it, they die of colic, if they leave it, they starve.

We may not feel the full effect immediately but I can see clearly that the future of independence gained at this price is going to be dark. I pray that God may not keep me alive to witness it.'

গান্ধীজির এই কথা শুনে গোটা ভারত আনন্দে আত্মহারা। আমাদের বাপুজি যখন এতবড় কথা বলছেন, তখন ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করে কার সাধ্যি! সুতরাং, আমরা অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতাই লাভ করব।

কিন্তু হায়! ভারতবাসীর এই স্বপ্ন — স্বপ্নই রয়ে গেল। তারা টেরই পায়নি গান্ধীজির চালাকি। দু'দিন বাদেই অবশ্য খুলে গেল গান্ধীজির মুখোশ। ধরা পড়ল আসল রূপ।

১৫ জুন, ১৯৪৭। দেশ-বিভাগের প্রস্তাব গৃহীত হল কংগ্রেসের অধিবেশনে। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হল সুচতুর গান্ধীজি সেই প্রস্তাব সমর্থন করলেন। তাঁর বক্তব্য ঃ 'ওয়ার্কিং কমিটি যখন দেশ-বিভাগের প্রস্তাব মেনে নিয়েছে, তখন নিখিল ভারত কংগ্রেসের পক্ষে সে প্রস্তাব গ্রহণ করাই উচিত। অন্যথায় কী মনে করবে পৃথিবীর মানুষ। হয়তো দেশের নেতৃত্ব তখন নতুন লোকের হাতে গিয়ে পড়বে, ফলে দেশ কংগ্রেসের অভিজ্ঞ লোকদের সহায়তা থেকে বঞ্চিত হবে। সেটা কোনওভাবেই কাম্য নয়।

চমৎকার গান্ধীজি! চমৎকার! সত্যিই তুমি বর্ণচোরা বহুরূপী। মনে হয় সেই জন্যই মাউন্টব্যাটেনকে প্যাটেল জোর দিয়ে বলেছিলেন, 'Gandhi would abide loyally by any decision.' কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যে

সিদ্ধান্ত নেবে, গান্ধীজি নিষ্ঠার সঙ্গে তার প্রতি আনুগত্য রক্ষা করে চলবেন। তলে তলে নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে গোপন বৈঠক হয়েছিল প্যাটেলের। তুমি ধরা পড়ে গেলে বাপুজি! তুমি মুখে এক, মনে আর এক! কোথায় গেল তোমার লম্ফঝম্ফ? 'আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি, ততক্ষণ দেশ-বিভাগে সম্মতি দেব না। দেশ ভাগ হলে আমার মৃতদেহের উপর দিয়ে হবে।' সত্যি সেটা হলে প্রমাণিত হত তুমি দেশপ্রেমিক। সত্যবাদী। সাহসী। কথায় ও কাজে এক।

দেশ-বিভাগের পক্ষে তুমি যে যুক্তির অবতারণা করেছ সেটা সম্পূর্ণ অর্থহীন, অসার। 'পৃথিবীর মানুষ কী মনে করবে।' নিজের দেশ যেখানে দু'টুকরো হবে সেখানে পৃথিবীর মানুষ কী ভাববে — সেটাই তোমার কাছে বড় হয়ে দাঁড়াল। এটা কোনও যুক্তিই নয়, স্রেফ ধাপ্পা। আসল ঘটনা হচ্ছে তোমার সেই একনশ্বর নেতৃত্বের সুরক্ষা। তোমার মুখ থেকেই বেরিয়ে পড়ল সেই সত্য — 'দেশের নেতৃত্ব তখন অন্য লোকের হাতে গিয়ে পড়বে।' তাঁরা হয়তো তোমাকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বেইমান বিশ্বাসঘাতক সদস্যদের মতো আর মানবে না। ভয়টা তোমার সেইখানেই বাপুজি। তাই তুমি মেনে নিলে দেশ-বিভাগ। এই পরিপ্রেক্ষিতে তোমাকে যদি দেশের শত্রু বলা হয় তবে কি খুব ভুল বলা হবে? দেশ-বিভাগের অপরাধীদের মধ্যে তুমিও কি একজন নও?

নীতিহীন নীতিকার

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট। ভারতবর্ষ স্বাধীন হল। স্বাধীনতা এল দেশ-বিভাগের বিনিময়ে। ভারত ভাঙল। জন্ম হল পাকিস্তানের।

এই দেশ-বিভাগের জন্য দায়ী কি শুধু জিন্না একাই?

না। নেহরু-প্যাটেল চক্রও সমান দায়ী। তার চেয়েও বেশি দায়ী গান্ধীজি স্বয়ং। কেন গান্ধীজি সবচেয়ে বেশি দায়ী — সেই কথায় আমি পরে আসছি। তার আগে দেশ-বিভাগের ব্যাপারে জিন্নার কথা শোনা যাক ঃ

'I never thought it would happen. I never expected to see Pakistan in my life.'

অর্থাৎ, আমি ভাবতেই পারিনি এ রকম কিছু হতে পারে। আমি আমার জীবদ্দশায় পাকিস্তানের মুখ দেখতে পাব এটা আশাই করিনি।

সত্যিই তাই। আশা করাটা সম্ভবও নয়। একটা দেশকে কি কারও মর্জিমতো ভাঙা যায় না ভাঙা সম্ভব?

সম্ভব তো নয়ই। একেবারে অসম্ভব।

সেই অসম্ভবও সম্ভব হল ক্ষমতালোভী নেহরু-প্যাটেল চক্রের জন্য। আর এই ব্যাপারে তাঁরা সমর্থন পেলেন ছদ্মবেশী গান্ধীজির কাছ থেকে। তাঁর সমর্থন না থাকলে অত সহজে সেদিন নেহরু-প্যাটেল চক্র দেশভাগ করতে পারত না। অথচ সারা দুনিয়া জানে অন্য কথা। দেশ-বিভাগের বিরুদ্ধেই নাকি সরব ছিলেন গান্ধীজি। ইতিপূর্বে আমি সে কথার- উল্লেখ করেছি। এখানে প্রয়োজন আছে বলে আবারও বলছি ঃ

'India could only be partitioned over my dead body alone. So long as I am alive, I will never agree to the parition of India.'

আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি কিছুতেই দেশ-বিভাগে সম্মতি দেব না। এত বড় ধাপ্পা ভাবাও যায় না। সারা দুনিয়ায় নিজের দেশকে নিয়ে কেউ এরকম ধাপ্পা দিয়েছে বলে আমার জানা নেই। কিন্তু গান্ধীজি দিতে পেরেছিলেন। এর পরও কি তাঁকে দেশপ্রেমিক বলা যায়?

আজাদকে যে গান্ধীজি বলেছিলেন, 'দেশ-বিভাগ হলে আমার মৃতদেহের উপর দিয়ে হবে।' হঠাৎ সেই গান্ধীজি দেশ-বিভাগ সমর্থন করলেন। কোনও প্রতিবাদ করলেন না। প্রতিবাদ তিনি অনেকভাবেই করতে পারতেন, কিন্তু করেননি।

উল্টে কী অপূর্ব অভিনয়টাই না করেছিলেন সেদিন তিনি। তাঁর মুখ থেকেই শোনা যাক সে কথা ঃ 'Everybody is eager to garland my photo and salute and not to follow me. Today I find myself all alone. Even the Sardar and Jawharlal think that my reading of the situation is wrong and peace is sure to return if partition

is agreed upon....'

অর্থাৎ, সবাই আমার ফটোতে মালা দেয়, প্রণাম করে, কিন্তু কেউ আমাকে অনুসরণ করে না। আজ আমি বড় একা। এমনকী সর্দার প্যাটেল এবং জওহরলাল পর্যন্ত মনে করে আমার চিন্তাধারা ভুল। দেশ-বিভাগই নাকি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনতে পারে।

গান্ধীজি, বরাবরই তুমি এর ঘাড়ে ওর ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিজে সাধুপুরুষ সাজার চেষ্টা করেছ। এবারও তাই করলে। কিন্তু ইতিহাস কথা কয়। তাকে মুছে ফেলা যায় না। সত্য চিরদিনই সত্য। আজও তোমার পুরো মুখোশ খোলেনি। তাই এখনও বহু লোক তোমাকে পুজো করে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ধীরে ধীরে তোমার পুরো মুখোশটা খুলে যাবে। সেদিনের আর বেশি দেরি নেই। দিন আগত ওই। সারা দেশের লোক জানে গান্ধীজিই দেশ-বিভাগের বিরুদ্ধে ছিলেন। জিন্না আর নেহরু-প্যাটেল চক্রই দেশ-বিভাগের জন্য দায়ী। দেশবাসী শুধু জানত গান্ধীজির ওই উক্তি 'আমি জীবিত থাকতে দেশভাগে রাজি হব না। দেশভাগ যদি হয়, সেটা হবে আমার মৃতদেহের উপর দিয়ে।'

সেদিনও দেশবাসী গান্ধীজির ওই উক্তি জানত, আজও প্রায় অধিকাংশ দেশবাসী এই কথাই জানে। অথচ গান্ধীজি দেশ-বিভাগের বিরুদ্ধে কোনও প্রতিবাদই করেননি। উল্টে সমর্থনই করেছেন।

প্রতিবাদের রাস্তাও তো তাঁর অজানা নয়। কথায় কথায় তিনি অনশন করতেন। নিজের দাবি আদায়ের জন্য বহুবার তিনি অনশন করেছেন। সেদিন কেন তিনি অনশনের কথা ভাবেননি। অনশনে মৃত্যুবরণ করেননি কেন? তাহলে তো তাঁর কথা সত্য প্রমাণিত হত। কিন্তু তা তো হয়নি। এখন কি আমরা বলতে পারি না গান্ধীজি একনম্বর মিথ্যাবাদী ধাপ্পাবাজ?

নেহরু-প্যাটেলদের হাতের মুঠোয় এনে মাউন্টব্যাটেন গান্ধীজিকে কটাক্ষ করে বলেছিলেন, 'Mr. Gandhi, to-day the Congress is with me and no longer with you.'

সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজি জবাব দিয়েছিলেন, 'But India is still with me.'

অর্থাৎ, মাউন্টব্যাটেনের বক্তব্য ছিল, 'মি. গান্ধী, এখন থেকে কংগ্রেস

আর আপনার সঙ্গে নয়, আমার সঙ্গে।'

গান্ধীজির জবাব, 'কিন্তু ভারতবর্ষ এখনও আমার সঙ্গে।'

ভারতবর্ষ যদি তোমার সঙ্গে ছিল, তাহলে তুমি সেদিন দেশ-বিভাগ মেনে নিলে কেন? কেন তুমি এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করলে না? কথা বলার সময় তো অনেক বড় বড় কথা বললে, কাজে তার ছিটেফোঁটাও দেখালে কি? দেখাবে কী করে? আসলে তুমি যে ব্রিটিশের চর।

এমনকী অনিল রায় এবং লীলা রায় যখন দেশ-বিভাগের বিরুদ্ধে তোমার কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন, তুমি তখন পাশ কাটিয়ে গেলে। বললে, 'আমার বয়েস হয়েছে। তোমরা আন্দোলন করো। আমি আছি।' তোমার এই ছলনা দেশবাসী বুঝতে পারেনি। তুমি ছিলে অসম্ভব ধূর্ত। নানা কৌশলে দেশবাসীকে বোকা বানিয়েছ। আজও বেশিরভাগ দেশবাসীকে বোকা বানিয়ে রেখেছ। সুর পালটাতে তোমার জুড়ি মেলা ভার। আজ যেটা বলছ, কালই সেটা পালটে অন্যটা বলছ। অবশ্য তার জন্য একটা অসার যুক্তি তুমি খাড়া করো সবসময়।

তুমি যে ব্রিটিশের চর তা আজ দিবালোকের মতো স্পষ্ট। তোমার মতো একজনকেই ব্রিটিশ তখন খুঁজছিল বৈপ্লবিক আন্দোলন বন্ধ করবার জন্য। মাঝেমধ্যে তোমাকে তারা জেলে আটক করত দেশবাসীর কাছে তোমার ভাবমূর্তি বাড়াবার জন্য। তা না হলে তো তুমি ধরা পড়ে যাবে। তুমি নিজের দেশের বিপদের কথা না ভেবে ইংল্যাণ্ডের কথা আগে ভাবো। ইংল্যাণ্ডের ক্ষতি তোমার বুকে শেলের মতো বেঁধে। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতেই ব্যক্ত করলে তোমার মনের কথা ঃ

'My own sympathies were with England and France from the purely humanitarian standpoint. I told him that I could not contemplate without being stirred to the very depth, the destruction of London which had hitherto been regarded as impregnable. As I was picturing before him the House of Parliament and the Westminister Abbey and their possible destruction. I broke down. I have become disconsolate.

I am not, therefore, just now thinking of India's deliver-

ance. It will come but will it be worth, if England and France fail.

অর্থাৎ, এ যুদ্ধে আমার সহানুভূতি ব্রিটিশ ও ফ্রান্সের দিকে। ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্ট ভবন বা ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবে ধ্বংস হবে, এ দৃশ্য আমার পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার কথা এখন আমি মোটেই ভাবছি না। ইংল্যাণ্ড বা ফ্রান্স যদি স্বাধীনতা হারায়, তবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দিয়ে কী হবে?

অদ্ভুত কথা! ভারতের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেনাপতির মুখে এই উক্তি! সত্যিই বিস্ময়।

গান্ধীজির মুখের এই উক্তির পরে তাঁকে ব্রিটিশের চর বলাটা কি অন্যায় না অশোভন? এ ক্ষেত্রে তাঁকে দেশদ্রোহী বা দেশের শত্রু বললেও ভুল বলা হয় না।

দিনের পর দিন ব্রিটিশ ভারতবাসীর উপর অত্যাচার করেছে এবং তখনও করছে। পরাধীন করে রেখেছে ভারতবর্ষকে। তাদের বিপদে ভারতবাসীর মাথাব্যথা হবে কেন? তা ছাড়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধেও গান্ধীজি সহযোগিতা করেছিলেন ব্রিটিশের সঙ্গে। তার বিনিময়ে কী পেয়েছিল ভারত? জালিয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ছাড়া আর কিছু কি পেয়েছিল? তবুও গান্ধীজি সেই নির্মম নিষ্ঠুর অত্যাচারী ব্রিটিশকেই সাহায্য করতে চান। তাদের বিপদে তাঁর বুক ফেটে যায়। যে কোনও আন্দোলনে একটা পটকা ফাটলেও অহিংসার দোহাই দিয়ে গান্ধীজি আন্দোলন বন্ধ করেন। আর জালিয়ানওয়ালাবাগের ওই নির্মম হত্যাকাণ্ডের পরেও সহিংস ব্রিটিশদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি উছলে ওঠে। জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার কিছুটা উল্লেখ করছি অহিংস গান্ধীজির ব্রিটিশকে সমর্থনের জন্য ঃ

'জালিয়ানওয়ালাবাগ......

শত সহস্র নিরাপরাধ নরনারীর রক্তে সেদিন লাল হয়ে গিয়েছিল ঐতিহাসিক জালিয়ানওয়ালাবাগের মাটি। বৃদ্ধ, যুবক, শিশু কেউ বাদ যায়নি। এমনকী গর্ভবতী নারীরা পর্যন্ত সেদিন রেহাই পায়নি পাঞ্জাবের কুখ্যাত ঐ গভর্নর মাইকেল ডায়ার এবং তার উপযুক্ত সহচর সেনাধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হ্যারি ডায়ারের পাশবিক অত্যাচার থেকে।

শুধু অস্ত্রহীন, অবলম্বনহীন নির্দোষ নরনারীকে বুলেটের বন্যায় ধরাশায়ী করেই ওরা সেদিন ক্ষান্ত থাকেনি। শহরের গণ্যমান্য নাগরিকদের ঘর থেকে বাইরে টেনে এনে বুকে হেঁটে পথ চলতে বাধ্য করা, প্রকাশ্য রাজপথে তাদের দিয়ে নাকে খত্ দেওয়ানো, যুবকদের বেত মেরে মেরে অজ্ঞান করা, মেয়েদের বেআব্রু করে থুথু দেওয়া, সভ্যতার মুখোশ পরা সেই নরপশুদের কাছে এসব ছিল সেদিন একটা খেলা মাত্র। খবর শুনে সারা দেশ স্তম্ভিত। তারপরই আসমুদ্রহিমাচল ফেটে পড়ল তীব্র প্রতিবাদে। ধিক্ তোমাদের, শত ধিক্! এই কি তোমাদের সভ্যতার নমুনা! তোমরা পশুরও অধম। কোটি কোটি নিপীড়িত মানুষের ক্ষোভ ও বেদনা ভাষায় রূপ পেল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে। নিজের 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করে বড়লাট লর্ড চেমস্‌ফোর্ডকে তিনি লিখলেন ঃ 'বিচারের নামে যারা আমাদের দেশের অসহায় নরনারীকে এভাবে নির্বিচারে হত্যা করতে পারে, তাদের দেওয়া সম্মানের গুরুভার বইতে আমি অক্ষম।'

শুধু রবীন্দ্রনাথ নন, স্যার শঙ্কর নায়ারের মতো ব্রিটিশ ভক্ত নাগরিক পর্যন্ত বড়লাটের কাউন্সিল থেকে পদত্যাগ করলেন ক্ষুব্ধ হয়ে। যেভাবে আমার অসহায় দেশবাসীকে তোমরা হত্যা করেছ, তারপর শাসনকার্যের কোনও ব্যাপারে যুক্ত থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। দয়া করে আমাকে রেহাই দাও।

উত্তরে ব্রিগেডিয়ার জেনারেলের সে কী দম্ভোক্তি! সে কী অট্টহাসি — 'দুর্ভাগ্য, আমার কাছে সেদিন এক হাজার দুশো পঞ্চাশ রাউণ্ড গুলির মধ্যে আর একটাও অবশিষ্ট ছিল না। থাকলে তারও সদ্ব্যবহার করতাম। রাস্তাটা সরু, তাই মেশিনগান দুটো ভেতরে নিয়ে যেতে পারিনি। পারলে আমার চাইতে বেশি খুশি বোধকরি আর কেউ হত না।'

একই কথার প্রতিধ্বনি শোনা গেল পাঞ্জাবের গভর্নর মাইকেল ও' ডায়ারের মুখ থেকে। ঠিকই করেছেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল। নেটিভরা উপযুক্ত শাস্তিই পেয়েছে। বিলেতের হাউস অফ লর্ডস্-এর সেই একই অভিমত। উল্টে তাঁরা আরও অভিনন্দন জানালেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডায়ারকে। তার চাইতেও বেশি করলেন বিলেতের অভিজাত শ্রেণীর নরনারীগণ। শুধু অভিনন্দন নয়, সঙ্গে ছাব্বিশ হাজার পাউণ্ড তাঁরা

ব্রিগেডিয়ার জেনারেলকে পুরস্কার দিলেন তার এই অসাধারণ বীরত্বের জন্য।' (আমি সুভাষ বলছি ঃ শৈলেশ দে — প্রথম খন্ড, পৃ. ৩২৮-৩২৯)।

এই হচ্ছে সুসভ্য ব্রিটিশের চরিত্র। আর এই ব্রিটিশের কোনও ক্ষতি গান্ধীজি সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর এই ধরনের অদ্ভুত আচরণের জন্য ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি অনেক দেরিতে আসে। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের হিংস্র আচরণকে তিনি কি কখনও অহিংসার বুলি আওড়ে থামাতে পেরেছেন? না, পারেননি। তিনি নিজেও কি অহিংস ছিলেন? না, ছিলেন না। প্রমাণ তাঁর নিজের কথা। গান্ধীজিই একদিন দেশবন্ধুর গৃহে বাংলার বিপ্লবী নায়কদের ডেকে বলেছিলেন ঃ

'Had India sword I would have asked her to draw it. But as she had no sword — I ask her to adopt non-violent, non-co-operation ..... I am out to destroy this satanic Government.'

এই গান্ধীজি আবার একদিন বললেন, 'হিংসার বদলে অহিংসা প্রয়োগ করলে স্বাধীনতা যদি একশ বছর পরেও আসে, সেটাই কাম্য।' পরাধীন ভারতে বেশিরভাগ মানুষ ধর্মভীরু কুসংস্কারাচ্ছন্ন অশিক্ষিত ছিল বলেই তাঁর এই ধাপ্পাবাজি ধরতে পারত না। তাই তাঁকে সমাদরে মাথায় রাখা হত। আজও বেহাল কংগ্রেস সেই চেষ্টাই করে চলেছে।

গান্ধীজির রাজনীতিতে কোথাও চিন্তার সঙ্গতি ছিল না। এর পেছনে কোনও যুক্তিও ছিল না। নিজের সুবিধাবাদী আবোল-তাবোল কাজকে ব্যাখ্যা করতে তিনি সত্যের দোহাই দিতেন। আসলে তাঁর সঠিক সুনির্দিষ্ট কোনও পথই ছিল না। তাই আত্মশক্তি, বিবেকের বাণী, উপবাস, প্রার্থনা, চিত্তশুদ্ধি ইত্যাদি কথার অবতারণা করতেন।

বহু মানুষই তাঁর রাজনীতিকে যুক্তিহীন ভাবতেন। কিন্তু ভাবলে কী হবে! কেউ বাধা দিতে পারতেন না। যিনি দিতে যাবেন, তিনিই শেষ। এই ছিল গান্ধীজির নীতিহীন নীতি। গান্ধীজির একটার পর একটা মারাত্মক ভুলের জন্যই দেশ-বিভাগ হয়েছিল। আমি সে সব পরে তুলে ধরছি।

ব্রিটিশ পুলিশ

কংগ্রেসে গান্ধীজির কথাই ছিল শেষ কথা। তিনি যা বলবেন তাই হবে। একমাত্র সুভাষচন্দ্র বসু ছাড়া ভারতীয় কোনও নেতাই তাঁর বিরুদ্ধে টু-শব্দটি করতে সাহস পেতেন না।

গান্ধীজির কথার সঙ্গে কাজের মিল ছিল খুবই কম। ইতিপূর্বে আমি এ কথা উল্লেখ করেছি। আবার উল্লেখ করছি ব্রিটিশদরদী গান্ধীর ছলনার জন্য। পরেও হয়তো অনেকবারই উল্লেখ করব চতুর গান্ধীজির মুখোশ পুরোপুরি খোলার জন্য। সবাই জানুক মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী আসলে কী ছিলেন।

জালিয়ানওয়ালাবাগে ব্রিটিশের নির্মম নিষ্ঠুর অত্যাচার আর হত্যাকাণ্ডের জন্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করলেন। স্যার শঙ্কর নায়ার বড়লাটের কাউন্সিল থেকে পদত্যাগ করলেন। আর অহিংস সাধক মহাত্মা গান্ধী কী করলেন? মুখে কুলুপ এটে রইলেন। ব্রিটিশের এই চরম হিংসাত্মক কাজের কোনও প্রতিবাদ তো করলেনই না, উপরন্তু বললেন ব্রিটিশ-সিংহ এখন খেপে আছে। তাই ব্রিটিশের বিরুদ্ধে এখন কোনও কিছু বলা ঠিক হবে না।

হায়রে অহিংস সাধক! চমৎকার তোমার অহিংস নীতি। জার্মানরা ব্রিটিশদের আক্রমণ করলে ব্রিটেনের প্রতি তোমার দরদ উছলে পড়ে। আর সেই ব্রিটিশ যখন ভারতবাসীদের কুকুর-বেড়ালের মতো হত্যা করল তুমি তখন যুক্তিহীন যুক্তি খাড়া করে নীরব রইলে। সারা জীবন তুমি এই ছল-চাতুরি করে গেছ। নিজের স্বার্থ ছাড়া কিছুই বোঝোনি। ধর্মভীরু দেশ তোমার ছদ্মবেশ ধরতে পারেনি। তাই তো তুমি দেবতা সেজে বসেছিলে। যারা তোমার চালাকি বুঝে ফেলত, তাদের তুমি সরিয়ে দিতে। ভারতবর্ষ বলেই এটা সম্ভব হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে নেতাজি সুভাষের 'The Indian Struggle' গ্রন্থের কিছু অংশ এখানে তুলে ধরছি ঃ

'Born in another country he might have been complete misfit. What, for instance, would he have been in a country like Russia or Germany or Italy? His doctrine of non-violence

would have led him to the cross or to the mental hospital. In India it is different. His simple life, his vegetarian diet, his goat's milk, his day of silence every week, his habit of squatting on the floor instead of sitting on a chair, his loin cloth in fact every thing connected with him has marked him out as one of the eccentric Mahatmas of old and has brought him nearer to the people.' (*Netaji Collected Works — Volume & Page – 327*).

অর্থাৎ, অন্য দেশে জন্মগ্রহণ করলে গান্ধীজি পুরোপুরি অযোগ্য বলে বিবেচিত হতেন। রাশিয়া বা জার্মানি অথবা ইতালির মতো দেশে জন্মালে তিনি কী করতেন? তাঁর এই অদ্ভুত অহিংস নীতির জন্য হয় তাঁর প্রাণদণ্ড হত, নয়তো তাঁকে পাগলা গারদে পাঠানো হত। ভারতবর্ষ বলেই তাঁর সরল জীবন, নিরামিষ আহার, ছাগলের দুগ্ধ পান, সপ্তাহে একদিন মৌনব্রত, চেয়ারে না বসে মেঝেতে বসা, কটিবস্ত্র পরিধান প্রভৃতি তাঁকে প্রাচীনকালের মহাত্মাদের মতো করে তুলেছিল। এবং এই সবের জন্যই তিনি সহজে জনসাধারণের কাছে পৌঁছেও গিয়েছিলেন।

ভারত ধর্মভীরু ভাববাদী দেশ বলেই গান্ধীজির উল্টোপাল্টা কাজকর্মকে অবতারের কাজ বলে মনে করত বেশিরভাগ দেশবাসী। তাই তাঁর এই সব আবোল-তাবোল ব্যাপারে প্রতিবাদের চেয়ে সমর্থন জুটত বেশি। এখানে তথাকথিত মহাপুরুষগণের পাগলামির মধ্যে দেবত্ব আরোপ করা হয়। আর সেই সুযোগ লাভের জন্যই তাঁর আশ্রম প্রতিষ্ঠা এবং ধর্ম ও রাজনীতিকে এক করে ফেলা। একবিংশ শতাব্দীতেও আমরা এই জিনিসই দেখছি।

সাপের মুখে চুমু খাওয়া এবং ব্যাঙের মুখে চুমু খাওয়া ছিল গান্ধীনীতি। জনপ্রিয় হওয়ার জন্য বিপ্লবীদের সামনে বলছেন, 'আমার হাতে অস্ত্র থাকলে আমি এই শয়তান ব্রিটিশকে অস্ত্র দিয়েই শায়েস্তা করতাম।' আবার জনসাধারণকে বলছেন, 'প্রতিপক্ষের আঘাত যতই তীব্র হোক না কেন, তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে জনসাধারণের কিছুতেই বলপ্রয়োগ করা উচিত নয়। ব্রিটিশের মন জয় করেই মুক্তি অর্জন করতে হবে।' সাধারণ মানুষ এই

কথায় খুশি হয়ে গান্ধীজির প্রশংসায় ছিল পঞ্চমুখ। ব্রিটিশও। কারণ, ভারতে এমন একজন বন্ধু তাদের চাই যিনি বিপ্লবীদের বিরুদ্ধাচরণ করবেন। তাই তারা পেল গান্ধীজিকে। একজন ভারতীয় জনপ্রিয় নেতা ভারতীয় বিপ্লবীদের দমন করতে উৎসাহী — এর চাইতে ব্রিটিশের কাছে আনন্দের আর কী হতে পারে! এ প্রসঙ্গে ব্রিটিশ ঐতিহাসিকের কথাই আমি তুলে ধরছি এখানে ঃ

'The British felt they had little to fear from Gandhi himself, they soon recognized him for what he was — an anti-Western reformer.

As long as Gandhi was in control of Congress, they knew they had an ally. As long as civil disobedience remained non-violent, it did not greatly worry the Government.

Who was hurt by non-co-operation? Only the Indians. Gandhi's whole aim was to minimize violence, the Government's was the same. They were still capable of controlling a few outbreaks of small scale violence, but if once Gandhi ceased to dominate Congress, the machine he had built up might well be used by more dynamic and violent people. A full scale rebellion could not be crushed.

So the Government obliged Gandhi by treating him with considerable respect jailing him occasionally to keep up appearances while they took much more positive action against terrorists and those western-style revolutionaries whom they really feared.' (*The Last Years of British India : Michael Edwards : P-57).*

অর্থাৎ, ব্রিটিশ বুঝতে পেরেছিল যে, গান্ধীর কাছ থেকে তাদের ভয় পাবার কিছু নেই। আসলে তিনি ছিলেন শুধু পাশ্চাত্য সভ্যতা বিরোধী একজন সংস্কারক।

যতক্ষণ গান্ধী কংগ্রেসের কর্ণধার থাকছেন, ততক্ষণ তারা নিশ্চিত যে

কংগ্রেসের মধ্যে তাদের একজন সত্যিকারের মিত্র আছে। যতক্ষণ তাঁর অসহযোগ আন্দোলন অহিংস থাকছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সরকারের বিচলিত হবার কারণ নেই।

গান্ধীর এই অসহযোগ আন্দোলনে ক্ষতি ভারতীয়দেরই। তাঁর উদ্দেশ্য হিংসাত্মক কার্যকলাপ দমিয়ে রাখা। সরকারের উদ্দেশ্যও ছিল ঠিক তাই। ছোটখাটো দু-একটা হিংসাত্মক ঘটনা দমন করার ক্ষমতা সরকারের ছিল। কিন্তু গান্ধী যদি কংগ্রেসে না থাকেন, তা হলে এই দল এমন লোকের হাতে যেতে পারে, যারা প্রচণ্ড গতিশীল এবং সহিংস। তাদের বিদ্রোহ সরকার সামলাতে পারত না। সুতরাং, এই জন্য গান্ধীকে তারা সম্মান প্রদর্শন করত। এবং জনমানসে তাঁর ভাবমূর্তি অম্লান রাখার জন্য মাঝেমধ্যে তাঁকে গ্রেপ্তার করে জেলে আটকে রাখা হত। আসলে সরকার ভয় পেত বিপ্লবীদের।

এটা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে গান্ধীর জেলে ঢোকা মানে তাঁর মুখোশটা ঠিক রাখা। ব্রিটিশ এই কৌশল অবলম্বন করত স্রেফ ভারতবাসীদের বোকা বানাবার জন্য।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। শূন্য হাতে গোলটেবিল বৈঠক থেকে ফেরার পর গান্ধীজি সম্মান বাঁচাতে আবার আন্দোলনের ডাক দিলেন। সরকারও আগে থেকে তৈরি ছিল। তাই আন্দোলনকারীদের উপর চালায় নির্মম নিষ্ঠুর অত্যাচার। ইংলন্ডের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন বহু মানুষ এতে বিচলিত হন। লন্ডনের 'India League delegation'-এর একজন প্রতিনিধি ছিলেন Ellen Wilkinson। পরে তিনি মন্ত্রী হয়েছিলেন। তিনিও ভারতে আসেন দলের একজন প্রতিনিধি হিসেবে। সরকারের নির্মম অত্যাচারের অনেক কিছুই তাঁর গোচরে আসে। সারা ভারত ঘুরে এ বিষয়ে সব তথ্য যোগাড় করে এক বিস্ময়কর মন্তব্য করেন তিনি ঃ 'Gandhi was the best policeman the British had in India.'

অর্থাৎ, গান্ধীই ছিলেন ভারতে ব্রিটিশের সেরা পুলিশ। ইংল্যান্ডের লেবার পার্টির এম পি মানুষ চিনতে ভুল করেননি। এবং তিনি সত্যি কথা বলতেও পিছপা হননি। নিজে একজন ইংরেজ হয়েও তাঁর এই মন্তব্য।

গান্ধীজির এত ব্রিটিশ প্রীতি সত্ত্বেও চার্চিল কেন তাঁকে সহ্য করতে

পারতেন না? সে বিষয়ে আলোচনায় আসার আগে আমি গান্ধীজি সম্বন্ধে চার্চিলের কিছু মন্তব্য তুলে ধরছি ঃ

'নয়া দিল্লিতে লর্ড আরউইনের সঙ্গে চুক্তি সই করছেন এক ভারতীয় রাজনীতিক, লন্ডনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের প্রতিক্রিয়া, 'দূর! মিডল টেম্পল থেকে পাশ-করা ব্যারিস্টার হাফ-নাঙ্গা ফকির হয়ে ভাইসরয়ের প্রাসাদে যাচ্ছে। ভাবলেও বমি পায়।......

গান্ধীকে প্রকাশ্যেই 'অর্ধ উলঙ্গ ফকির' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন তিনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার গোপন নথি জানাচ্ছে, উইনস্টন চার্চিল এখানেই থামেননি। ডাকসাইটে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভার বৈঠকে বলেছিলেন, 'ওই বাজে লোকটাকে মেরে ফেললেই ঠিক হয়।'

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রণনীতি নিয়ে গবেষণা করছেন ইতিহাসবিদ অ্যান্ড্রু রবার্টস। সেই জন্যই ওই আমলের ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার বৈঠকের নথিপত্র ঘাঁটছিলেন তিনি। একটি ব্রিটিশ সংবাদপত্রে গত কাল রবার্টস লিখেছেন, ক্যাটালগে চোখ বোলাতে বোলাতেই লরেন্স বারগিস নামে একজন আমলার নাম নজরে আসে তাঁর। ১৯৩৯-১৯৪৫ সালে যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভায় সহকারী উপসচিবের পদে ছিলেন তিনি। তাঁর কাজ ছিল, মন্ত্রিসভার বৈঠকগুলিতে চার্চিলের পাশে বসে যাবতীয় কথাবার্তার নোট নেওয়া। ঘটনা হল, ব্রিটিশ আইন অনুসারে ওই নোট বৈঠকের পরেই নষ্ট করে ফেলার কথা। কিন্তু রবার্টস আবিষ্কার করে চমকে গিয়েছেন যে, বারগিস তাঁর কোনও নোট নষ্ট করেননি। ফলে ওই বছরগুলোয় চার্চিল কার সঙ্গে কী কথা বলেছেন, চার দেওয়ালের মধ্যে কাকে নিয়ে কী মন্তব্য করেছেন, সমস্তই অক্ষত রয়ে গিয়েছে।

বারগিসের এই সব নথির সুবাদে চার্চিলের রণনীতি এবং কূটনীতি নিয়ে অনেক গোপন তথ্যই পেয়েছেন রবার্টস। সেই সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে গান্ধী সম্পর্কে চার্চিলের একাধিক উক্তি। যেমন, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধানমন্ত্রী ইয়ান স্মাটসকে চার্চিল বলেছিলেন, 'ভারতে আমাদের এত ঝামেলার জন্য আপনিই দায়ী। অতগুলো বছর গান্ধীকে ওখানে পেলেন (দক্ষিণ আফ্রিকা), নিকেশ করতে পারলেন না।'

স্মাটস উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমি যখন গান্ধীকে জেলে পুরেছিলাম বার

তিনেক — উনি আমাকে ঘরে পরার দু'পাটি চটি বানিয়ে দেওয়া ছাড়া আর তো কিছু করেননি।'

আর একবার, গান্ধী তখন অনশনে। চার্চিল মন্ত্রিসভাকে সাফ বলে দিলেন, 'ওই সব অনশন-টনশনের হুমকিতে ভয় পেয়ে গান্ধীকে জেল থেকে ছেড়ে দেওয়ার দরকার নেই। উনি মারা গেলে একটা বাজে লোকের হাত থেকে আমাদের নিষ্কৃতি মিলবে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটা শত্রু কমবে।'

(*আনন্দবাজার পত্রিকা* ঃ ২১.৯.২০০৮)।

চার্চিল গান্ধী সম্বন্ধে এই ধরনের মন্তব্য করলেন কেন? আমরা জানি গান্ধী ব্রিটিশের পরম মিত্র। তাঁকে চার্চিল চরম শত্রু বললেন কেন? কারণ, গান্ধীর দ্বিচারিতা। ভারতবাসী এই দ্বিচারিতা বুঝতে না পারলেও ব্রিটিশ বুঝেছিল। গান্ধী চতুর। ব্রিটিশ তাঁর চেয়েও চতুর। নেতাজি বলতেন, 'পাখির মধ্যে কাক, জন্তুর মধ্যে খেঁকশিয়াল আর মানুষের মধ্যে ব্রিটিশ হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ধূর্ত।' তাই গান্ধী নিজের দেশবাসীর চোখে ধুলো দিলেও ব্রিটিশের চোখে দিতে পারেননি। শুধু চার্চিলই নন, বড়লাট লিনলিথগোও কয়েকবার গান্ধীর ওপর বিরক্ত হয়েছিলেন এই দ্বিচারিতার জন্য।

গান্ধী একবার বড়লাট লিনলিথগোকে অনশনের হুমকি দেন। তাতে তিনি লেখেন, 'I regard the use of a fast for a political purpose as a form of political blackmail (himsa) for which there can be no moral justification.'

(*Gandhi's correspondence with the Govt. 5th February, 1943*).

গান্ধী ব্রিটিশদরদী। তাদের সঙ্গে তাঁর খুবই ভালো সম্পর্ক। ব্রিটিশের বিপদে তাঁর বুক ফেটে যেত। কী করেননি তিনি তাদের জন্য!

ব্যুয়র যুদ্ধে অ্যাম্বুলেন্স বাহিনীর লোক সংগ্রহ করে দিয়েছেন। জুলু বিদ্রোহের সময় স্ট্রেচার বেয়ারার পার্টি গড়ে তুলেছেন। দিল্লিতে ওয়ার কনফারেন্সে লর্ড চেমস্‌ফোর্ডের আহ্বানে গান্ধী সৈন্য যোগাড় করে দিয়েছেন। ব্রিটিশকে নানা রকম সহযোগিতার জন্য লর্ড হার্ডিঞ্জ তাঁকে 'কাইজার-ই-হিন্দ্' সোনার মেডেল পর্যন্ত দিয়েছেন। তবুও সেই ব্রিটিশই তাঁর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করল। এর কারণ আগেই বলেছি। দ্বিচারিতা।

গান্ধীজির অপকর্ম

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর দ্বিচারিতার জন্য ব্রিটিশ খুবই বিরক্ত হত। তবুও বিপ্লবীদের দমনের জন্য তাঁকে হাতে রাখা দরকার। তাই বলে তো তাঁর বাজে স্বভাবটা সমর্থন করা যায় না। করেনওনি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল। ব্রিটিশ ক্যাবিনেটে যে কথা গোপনে বলেছিলেন তিনি, পরবর্তী কালে দিল্লিতে সেই কাজই করেছিলেন নাথুরাম গড্‌সে। 'বাজে লোক' গান্ধীকে হত্যা করলেন নাথুরাম। আগে হত্যা করলে হয়তো দেশ-বিভাগই হত না।

গান্ধীর দ্বিচারিতার অন্ত ছিল না। জীবনে বহুবার তিনি কথার খেলাপ করেছেন। অসত্য বলেছেন। তবুও তিনি সত্যবাদী। সেই কথাই এখানে তুলে ধরছি। অনন্ত সিংহের মুখ থেকেই শোনা যাক সে কথা ঃ

'১৯৩১ সালের ৫ মার্চ গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট বা সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হল। গান্ধীজির শর্ত অনুযায়ী আইন-অমান্য আন্দোলনে ধৃত সমস্ত কংগ্রেসকর্মী মুক্তি পেল। হিংসাত্মক কার্যে দণ্ডিত বন্দিদের মুক্তির দাবিতে গান্ধীজি বড়লাট আরউইনকে কোনও অনুরোধ জানাননি। এমনকি, দেশবাসীর একান্ত আগ্রহ সত্ত্বেও ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেবের প্রাণদণ্ড রোধের জন্য কোনও দাবিও বড়লাটের কাছে পেশ করা প্রয়োজন মনে করেননি। ১৯৩১ সালের ২৩ মার্চ তাঁদের ফাঁসি হয়ে গেল। ব্রিটিশের Divide and Rule (বিভেদ সৃষ্টি করে শাসন করা) নীতির জয় হল — কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা কর, আর কঠোর হস্তে বিপ্লবীদের দমন কর।'

(*অগ্নিযুগের একটি অধ্যায় ঃ সাপ্তাহিক বসুমতী*, ১৮.৪.১৯৬৮)।

এ বার শোনা যাক যুগান্তর দলের অন্যতম নায়ক ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত এ বিষয়ে কী বলছেন, 'চুক্তি সই করে গান্ধীজি সিমলা ছাড়ার আগে বিবৃতি দিয়ে যান যে, ওই চুক্তি যদি দেশে সর্ববাদিসম্মতভাবে গৃহীত হয় তাহলে তিনি আশা করেন যে, এমনকি সহিংস কাজের জন্য যাঁদের ফাঁসির হুকুম হয়ে আছে, তাঁরাও মুক্তি পাবেন। বিবৃতি দিয়ে তিনি করাচি পৌঁছবার আগেই ভগৎ সিংদের ফাঁসি হয়ে যায়। ফলে, যুগান্তর ও নওজোয়ান সভার নেতৃত্বে দেশের জাগ্রত জনগণ যে বিক্ষোভ দেখায়, তাতে গান্ধী-নেতৃত্ব দেশের লোকের কাছে অনেকখানি প্রতিষ্ঠা হারায়।' (ইতিহাসের উপাদান ঃ সাপ্তাহিক বসুমতী, ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬)।

এখানেও গান্ধীজির দ্বিচারিতা দিবালোকের মতো স্পষ্ট। ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেবের প্রাণদণ্ড রোধের জন্য কোনও প্রচেষ্টা বা চুক্তি না করেই তিনি জানান, গান্ধী-আরউইন চুক্তি সর্ববাদীসম্মতভাবে গৃহীত হলে যাঁদের ফাঁসির হুকুম হয়েছে তাঁরাও মুক্তি পাবেন। এই বিবৃতি দিয়ে তিনি করাচি রওনা হন। তাঁর এই কথা শুনে জনসাধারণ আনন্দে আত্মহারা। কিন্তু অচিরেই তাদের আনন্দ বিষাদে পরিণত হয়। গান্ধীজির ধাপ্পা ধরা পড়ে। ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেবের ফাঁসি হয়ে যায়।

গান্ধীজির নেতৃত্ব তখন যথেষ্ট জনপ্রিয়তা হারায়। করাচিতে পৌঁছনো মাত্রই বিভিন্ন প্রদেশের বিক্ষুব্ধ তরুণদল তাঁকে সংবর্ধনা জানালেন কালো ফুলের মালা আর কালো পতাকা প্রদর্শন করে।

আরও একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। বাংলার পুণ্যাত্মা বাঙালির গর্ব শহিদ যতীন দাসের কথা এ বার বলব। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় ধরা পড়েন তিনি। তারপর ব্রিটিশের অন্যায় আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে শুরু করেন অনশন। তেষট্টি দিন অনশনের পর তাঁর মৃত্যু হয়। খবর শুনে গোটা পৃথিবী স্তম্ভিত। অত্যাচারী ইংরেজকে ধিক্কার জানাল বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ। ক্ষুব্ধ হলেন রবীন্দ্রনাথ। এর আগে আয়ারল্যান্ডের মুক্তিযোদ্ধা টেরেন্স ম্যাকসুইনিও এইভাবে অনশনে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। সেই ম্যাকসুইনি পরিবারও তার পাঠালেন সুদূর আয়ারল্যান্ড থেকে ঃ

'Family of Terence Mc Swiney have heard with grief and pride of the death of Jatin Das. Freedom will come.'

দেশ-বিদেশের মানুষ যখন যতীন দাসের মৃত্যুতে চরম মর্মাহত এবং বেদনা প্রকাশ করছে, গান্ধীজি তখন নীরব। এই দেশপ্রেমিক শহিদ সম্বন্ধে তাঁর মুখ থেকে একটি শব্দও উচ্চারিত হল না। বেশ কিছুদিন পরে সুভাষের জিজ্ঞাসার উত্তরে তাঁর বক্তব্য, যতীন দাসের মৃত্যু স্রেফ ইচ্ছাকৃত আত্মহত্যা। তাই ইচ্ছা করেই এতদিন চুপ করে ছিলেন তিনি। কারণ, বলতে হলে তাঁকে যতীন দাস সম্পর্কে অপ্রিয় কথাই বলতে হত।

অদ্ভুত উক্তি! গান্ধীজি চরম ভণ্ড বলেই এই উক্তি করতে পারলেন। অনশন তো তাঁরই রাজনৈতিক জীবনে প্রতিবাদের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। জীবনে বহুবারই তো তিনি অনশন করেছেন। তা হলে যতীন দাসের বেলায় তাঁর

এই উক্তির কারণ কী? গান্ধীজির মতো অনশন শুরু করে দু-চারদিন পরে লেবুর রস পান করে অনশন ভঙ্গ করেননি বলেই কি?

আসলে ব্যাপারটা তাই। গান্ধীজির অনশনটা ছিল স্রেফ ভয়-দেখানো। আর যতীন দাসের ছিল সত্যিকারের অনশন। সেখানে কোনও ছলনা বা চালাকি ছিল না। গান্ধীজির অনশন অনেকটা লোক-দেখানো। এ ক্ষেত্রে তিনি যতীন দাসের কাছে হেরে গিয়েছিলেন। তাই সেই পরাজয় সহ্য করতে পারেননি। গান্ধী চরিত্রের এটাও একটা অন্ধকার দিক। পরাজিত হলেই তিনি উল্টোপাল্টা বকেন।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী কোনওদিনই সহজ সরল মানুষ ছিলেন না। তাঁর মতো জটিল কু-চক্রী নেতা আজ পর্যন্ত ভারতে জন্মায়নি। তিনি মনে করতেন ভারতবর্ষ মানেই গান্ধী। আর তাঁকে ছাড়া দেশ অচল।

এ প্রসঙ্গে নাথুরাম গড়সে সুন্দর ভাবে গান্ধী-চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মুখ থেকেই শোনা যাক সেই কথা ঃ 'ভারতবর্ষে ফিরে আসার পর থেকেই গান্ধীজির মধ্যে একটা প্রভুত্বব্যঞ্জক আত্মসর্বস্ব মানসিকতা গড়ে উঠেছিল, যার ফলে তিনি ভাবতেন কী ভালো আর কী মন্দ তা বিচার করবার চূড়ান্ত অধিকারী ছিলেন তিনি একা। দেশ যদি তাঁর নেতৃত্ব চায় তবে তাঁর এই ভ্রান্ত মানসিকতাকেও মেনে নিতে হবে — আর তা যদি না করা হয় তবে তিনি কংগ্রেস থেকে দূরে দাঁড়িয়ে নিজের গোঁ ধরে চলবেন। গান্ধীজির এই মানসিকতার মাঝামাঝি রফা করার কোনও স্থান ছিল না। হয় কংগ্রেসকে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে, তাঁর উৎকেন্দ্রিকতা, খামখেয়াল, বিচিত্র ধর্মবোধ এবং আদিম অনুভবের খেলার পুতুল হয়ে থাকতে হবে — নতুবা তাঁকে ছাড়াই চলতে হবে। তিনি একাই ছিলেন প্রত্যেকের এবং প্রত্যেক ব্যাপারের একমাত্র বিচারক। গণ-অসহযোগ আন্দোলনের একমাত্র নিয়ন্ত্রক মস্তিষ্ক ছিলেন তিনি — সেই আন্দোলনের পদ্ধতি আর কেউ জানতেন না — তিনি একাই জানতেন কখন শুরু করতে হবে আর কখন আন্দোলন তুলে নিতে হবে। এতে আন্দোলন সফল হতে পারে বা ব্যর্থ হতে পারে, অবর্ণনীয় বিপর্যয় বা রাজনৈতিক হতাশা আসতে পারে — মহাত্মার অভ্রান্ততার কাছে তার পার্থক্য সামান্য। 'একজন সত্যাগ্রহী কখনও ব্যর্থ হয় না' তার অভ্রান্ততা প্রমাণে এটাই ছিল মূলতত্ত্ব — আর তিনি ছাড়া আর কেউ জানতেনও না

— কে ছিলেন প্রকৃত সত্যাগ্রহী। এমনি করে নিজের মামলা বিচারের তিনিই ছিলেন পরামর্শদাতার দল (জুরি), তিনিই ছিলেন বিচারক। এই শিশুসুলভ অন্তঃসারশূন্যতা এবং একগুঁয়েমির সঙ্গে তার জীবনযাত্রার অতি কৃচ্ছ্রতা, ছেদহীন কর্মপ্রয়াস ও বিচিত্র চরিত্রবত্তা মিশে গান্ধীজিকে ভয়ঙ্কর এবং অপ্রতিরোধ্য করে তুলেছিল। বহু মানুষই তাঁর রাজনীতিকে যুক্তিহীন ভাবতেন। কিন্তু সে অবস্থায় হয় তাকে নিজেকে কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে হত, না হয় গান্ধীজির পায়ের তলায় তার বুদ্ধিবত্তাকে লুটিয়ে দিয়ে তা নিয়ে যা খুশি করবার অধিকার তাকে দিতে হত। এমন এক দায়িত্বহীন পদমর্যাদা লাভ করে গান্ধীজি মারাত্মক ভুলের পর মারাত্মক ভুল করবার, ব্যর্থতার পর ব্যর্থতা অর্জনের, বিপর্যয়ের পর বিপর্যয় সৃষ্টির অপরাধে অপরাধী। তাঁর রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভের পর থেকে তেত্রিশ বছরের মধ্যে তাঁর পক্ষে একটিও রাজনৈতিক বিজয় দাবি করা যায় না।' (শুনুন ধর্মাবতার ঃ নাথুরাম গড্‌সে, পৃ. ৬০)।

নাথুরাম গড্‌সে যা বলেছেন তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। এ প্রসঙ্গে নেতাজি সুভাষের কথা উল্লেখ করছি ঃ '....whenever any opposition raised outside his cabinate, he could always coerce the public by threatening to retire from Congress or to fast unto death.' (*The Indian Struggle, P.-245*).

এই ভয়-দেখানোর কারণ কী, সে কথায় আমি এখন আসছি।

দ্য গ্রেট ডিক্টেটর

এটা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে একটা সময় কংগ্রেসনেতাদের মধ্যে গান্ধীজি ছিলেন সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। একমাত্র নেতাজি ছাড়া অন্য কোনও নেতা তাঁর জনপ্রিয়তার ধারেকাছে আসতে পারেননি। পরবর্তীকালে জনপ্রিয়তায় নেতাজি গান্ধীজিকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। সে কথা সবারই জানা।

এখন আমি আসব গান্ধীজির ভয়-দেখানো প্রসঙ্গে। কথায় কথায় কেন তিনি সবাইকে ভয় দেখাতেন? এর কারণ কী?

কারণ তাঁর একনম্বর নেতৃত্ব ও জনপ্রিয়তা যাচাই করে দেখা। আর এই ব্যাপারে যদি কেউ তাঁর বিরোধিতা করে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করত তাহলে তাকে খতম করাই ছিল অহিংস সাধকের একমাত্র উদ্দেশ্য। করেছেনও অনেককে। কিন্তু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বেশিরভাগ সদস্য তাঁর কোনও প্রস্তাবের বিরোধিতা করলে তিনি আমৃত্যু অনশনের ভয় দেখাতেন। তখন তাঁরা তাঁর দাবি মেনে নিতে বাধ্য হতেন।

এ বার দেখা যাক গান্ধীজির এত জনপ্রিয়তার কারণ কী ছিল। কংগ্রেসের তখনকার নামী নেতারাই ছিলেন বিত্তশালী। তাঁরা বড় একটা সাধারণ লোকের কাছে যেতেন না। সীমাবদ্ধ থাকতেন দলীয় কর্মসূচির মধ্যে। বক্তৃতা করতেন। সাংবাদিক সম্মেলন ডাকতেন। মাঝেমধ্যে আন্দোলনে নামতেন। ব্যস, ওই পর্যন্তই। একমাত্র নেতাজি সুভাষই সর্বত্র যেতেন। আর যেতেন গান্ধীজি। তাঁর আশ্রমে তো সবরকম লোক আসত। তাই তাঁর সরল সাধারণ জীবন যাপনের প্রচার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল।

গান্ধীজির জীবন যাপন কেমন ছিল এবং কী ভাবে চলতেন তিনি, তার উল্লেখ করছি। (এক) ধর্মভীরু দেশে তাঁর আশ্রম প্রতিষ্ঠা, (দুই) অহিংসার বাণী, (তিন) কটিবস্ত্র পরিধান, (চার) মুণ্ডিত মস্তক, (পাঁচ) সন্ন্যাসীর মতো হাতে লাঠি, (ছয়) অর্জুনের মতো আজানুলম্বিত বাহু, (সাত) নিরামিষ আহার, (আট) ছাগলের দুগ্ধ পান, (নয়) নিয়মিত চরকা চালিয়ে সুতো কাটা, (দশ) চেয়ারে না বসে মেঝেতে বসা, (এগারো) সপ্তাহে একদিন মৌনব্রত, (বারো) সরল জীবন যাপন, (তেরো) সর্বোপরি ধর্মের চাল।

এই সবের জন্যই গান্ধীজি ভারতবর্ষের মতো ধর্মভীরু ভাববাদী দেশে প্রচণ্ড জনপ্রিয় হয়েছিলেন। দিনকে দিন তাঁর সেই জনপ্রিয়তা বেড়েই চলেছিল। আর এই জনপ্রিয়তার জন্যই তিনি হয়েছিলেন বেপরোয়া। কথায় কথায় তাই সবাইকে আমৃত্যু অনশন এবং কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে যাবার ভয় দেখাতেন। গণতন্ত্রের ধার ধারতেন না। যা খুশি তাই করতেন। নিয়ম-কানুন মানতেন না। এককথায় তিনি ছিলেন ডিক্টেটর। তাই তিনি সাম্যবাদের সমর্থক ছিলেন না। উপদ্রবসৃষ্টিকারী বলে লেনিনকে সমর্থন করেননি।

সমর্থন করেছেন ইতালির ফ্যাসিস্ট ডিক্টেটর মুসোলিনিকে, যাঁর নিন্দায় আজও সারা দুনিয়া মুখর। অথচ যে লেনিনকে তিনি সমর্থন না করে তাঁর নিন্দা করলেন, সেই লেনিনই বলতে গেলে সাম্যবাদের পথপ্রদর্শক।

গোলটেবিল বৈঠক থেকে ফেরার পথে গান্ধীজির দেখা হয় মুসোলিনির সঙ্গে। মুসোলিনির সঙ্গে কথাবার্তা বলে তিনি খুশি। এ প্রসঙ্গে মনীষী রোমা রোঁলাকে লেখা তাঁর একখানি চিঠির উল্লেখ করছি। কী লিখেছিলেন অহিংস সাধক মহাত্মা গান্ধী সেই চিঠিতে?

'আমার নিকট মুসোলিনি একটি ধাঁধা বিশেষ। তাঁর অনেক সংস্কারের কাজ আমি সমর্থন করি। আমার মনে হল, তিনি কৃষকদের জন্য অনেক কিছু করেছেন। আমি মনে করি গরিবদের জন্য তাঁর দরদ, বৃহৎ শহরিকরণের প্রতি তাঁর বিরোধিতা, শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য তাঁর প্রচেষ্টা আমাদের কাছে বিশেষভাবে আকর্ষণীয়।

....আমাকে যা আকর্ষণ করেছে তা হল মুসোলিনির কঠোরতার পেছনে রয়েছে জনসাধারণকে তাঁর সেবা করার বাসনা। এমনকী তাঁর কড়া বক্তৃতার পেছনেও রয়েছে একটা সততা ও তাঁর দেশবাসীর প্রতি উদ্দীপ্ত প্রেম। আমার আরও মনে হয় ইতালির জনসাধারণ তাঁর এই কঠিন কঠোর বজ্রমুষ্টিকে পছন্দ করে।'

রোমা রোঁলা অবাক। এ কোন গান্ধী! যাঁকে এতদিন অহিংস সাধক, সন্ন্যাসী ও সত্যের পূজারী হিসেবে শ্রদ্ধা করে এসেছি — ইনি কি সেই গান্ধী?

রোমা রোঁলার মুখ থেকেই শোনা যাক সে কথা ঃ

'গান্ধী সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি তা গ্রহণও করবেন না, অধ্যয়নও করবেন না। যে সময়ে তাঁকে একটা দিক বেছে নিতে হবে, সে সময়ে তিনি দুটি দিকের মধ্যেই ভেসে বেড়াচ্ছেন। সামাজিক সংঘর্ষের সময়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ইতস্তত করার অর্থই হল শোষিত শ্রেণির বিরুদ্ধে শোষক শ্রেণিকেই লাভবান হতে দেওয়া।

গান্ধীর এই মনোভাব অহিংসার প্রতি তাঁর গভীর বিশ্বাস থেকেই উদ্ভুত এবং তিনি নিজেই বলেছেন তাঁর এই বিশ্বাস ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল। এই বিশ্বাস যত পবিত্রই হোক না কেন, তা তাঁর দৃষ্টির

স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে।

সামাজিক অভিজ্ঞতা সবসময়ই মুক্ত ও চলমান। তা কখনও কোনও ধর্মীয় বিশ্বাস বা অনুভূতি সাপেক্ষ হয়ে থাকতে পারে না। অতীতের এই প্রভাব যা গান্ধীর অগ্রগতিতে এখন বাধা সৃষ্টি করছে।'

আগেও গান্ধীজির আবোল-তাবোল কথার উল্লেখ করেছি। এখানেও আবার বলছি তিনি এই সব কথা বলে নিজেকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। যে মুসোলিনিকে তাঁর নিজের দেশ ঘৃণার চোখে দেখেছে, নিন্দা করেছে সারা বিশ্ব — সেই মুসোলিনির প্রশংসায় পঞ্চমুখ গান্ধীজি। মনে হয় এর একটাই কারণ — মুসোলিনি ছিলেন গ্রেট ডিক্টেটর, গান্ধীজিও তাই।

এ বার আর একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। এটা আরও বিস্ময়কর। এখানে গান্ধীজির অবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা এবং পাগলামি দিনের আলোর মতো ফুটে উঠেছে।

১৯৩৪ সাল, ১৫ জানুয়ারি। ভয়াবহ ভূমিকম্প হল বিহারে। কুড়ি হাজারের মতো মানুষ মারা গেল সেই ভূমিকম্পের ফলে।

খবর শুনে চমকে উঠল গোটা ভারতবর্ষ। তার চাইতেও বেশি চমকে উঠল গান্ধীজির একটা মন্তব্যে। তাঁর মতে এই ভূমিকম্পের জন্য দায়ী সমস্ত বিহারবাসীর অস্পৃশ্যতা বোধ। সেই পাপের জন্যই বিহারবাসীদের এই শাস্তি দিয়েছেন ভগবান।

সর্বত্র চাপা গুঞ্জন। সর্বত্র গান্ধীজির বিরুদ্ধে আলোচনা আর বিরূপ সমালোচনা। ভারতবর্ষ বলেই গান্ধীজি এই সব আজেবাজে কথা বলতে পেরেছিলেন। পশ্চিমি কোনও দেশ হলে গান্ধীজির কপালে দুঃখ ছিল।

গান্ধীজির এই মন্তব্য শুনে বিস্ময়ের ধাক্কায় ছিটকে পড়েন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। প্রতিবাদ করে তিনি বলেন ঃ

'যাঁরা অস্পৃশ্যতার সামাজিক সংস্কারে বিশ্বাস করেন, গান্ধীজি তাঁদের বিরুদ্ধে এই বলে অভিযোগ করেছেন যে, এই পাপের জন্যই ঈশ্বরের রোষানল বিহারের কিয়দংশের উপর, স্পষ্টত তার বিশেষ নির্বাচিত স্থান হিসেবে পতিত হয়েছে।

এই কথা পাঠ করে আমি অত্যন্ত বেদনাজনক বিস্ময় বোধ করছি।

আরও এক দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার এই যে, বিশ্বঘটনা সম্পর্কে এই ধরনের অবৈজ্ঞানিক চিন্তা আমাদের দেশের এক বৃহৎ সংখ্যক মানুষ অনায়াসে মেনে নেয়।

.......মহাত্মাজী তাঁর বিস্ময়কর প্রেরণা দ্বারা দেশবাসীর মনে যে ভয় ও ভীরুতা সঞ্চিত ছিল তা থেকে সকলকে মুক্তির জন্য উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছেন; তার জন্য তাঁর কাছে আমরা যারা অশেষভাবে কৃতজ্ঞ বলে মনে করি, তারাই আবার মনে অত্যন্ত বেদনা বোধ করি, যখন দেখি যে, মহাত্মাজীর মুখ হতে এমন বাণী নিঃসৃত হচ্ছে, যা সেই সব দেশবাসীর মনে অযুক্তির উপাদান সমূহকে বড় করে তুলতে পারে — এই অযুক্তিই সকল অন্ধশক্তির আকর — যা আমাদের জোর-পূর্বক স্বাধীনতা ও আত্মসম্মানের পথ হতে দূরে সরিয়ে নিতে পারে।'

আগেই বলেছি সুচতুর গান্ধীজি ভারতবাসীর নাড়ি টিপে দেখে নিয়েছিলেন যে অধিকাংশ ভারতবাসী কী চায়! এই বিরাট ভারতবর্ষে বেশিরভাগ মানুষই অশিক্ষিত। শিক্ষিতের সংখ্যা খুব অল্পই। তা ছাড়াও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় বিশ্বাসী মানুষের সংখ্যা হাতে গোনা যায়। তাই এখানে ভগবান আর ধর্মের দোহাই দিয়ে সব কিছু করা যায়। আর তাতেই বাহবা মেলে এবং ঈশ্বরের দূত হওয়া যায়। সুতরাং, রবীন্দ্রনাথের ওই বৈজ্ঞানিক যুক্তি মেনে লাভ কী! মানলে তো তাঁর ক্ষতি। অশিক্ষিত মানুষের কাছে ঈশ্বরের দূত হতে পারবেন না। তাই তিনি সুকৌশলে রাখলেন তাঁর বক্তব্য ঃ

'শান্তিনিকেতনের কবি শুধু শান্তিনিকেতন আশ্রমবাসীদের গুরুদেব নন, আমারও গুরুদেব। .... আমি ভুল করেছি, এই যখন তাঁর বিশ্বাস, তখন প্রতিবাদ করার অধিকার তাঁর নিশ্চয়ই আছে। আর তাঁর প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধা আছে বলেই তাঁর কথা আমি অন্যান্য সমালোচক অপেক্ষা অধিক আগ্রহের সঙ্গে শুনে থাকি। তাঁর বিবৃতিটি আমি তিনবার পাঠ করেছি, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি ওই বিবৃতিতে যা বলেছি, এখনও তারই সমর্থন করছি।

অনাবৃষ্টি, বন্যা, ভূমিকম্প এবং অনুরূপ যা কিছু দেখা দেয় — যদি ওইগুলি প্রাকৃতিক বা বস্তুগত কারণ-সম্ভূত বলে অনুভূত হয়, কিন্তু আমার মনে হয় যে, ওইগুলি মানুষের নৈতিক আচরণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সেই

কারণেই আমি আমার প্রকৃতিগতভাবেই স্থির করে নিয়েছিলাম যে, অস্পৃশ্যতার পাপের জন্যই ভূমিকম্পটি সংঘটিত হয়েছে।'

চমৎকার গান্ধীজি, চমৎকার। তোমার মতো সুচতুর নেতা পৃথিবীতে খুব কমই জন্মগ্রহণ করেছে। অশিক্ষিত দরিদ্র দেশবাসীকে ধর্মের এই আফিম খাইয়েই তো তুমি অত জনপ্রিয় হয়েছিলে। তাই তো তুমি যখন-তখন সবাইকে ভয় দেখাতে। তোমার গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যই তুমি তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলে, অন্য কারও কথা তো কোন ছার।

এ প্রসঙ্গে আমি আমার নিজের দেখা একটি ঘটনার উল্লেখ করছি।

আমি তখন দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুরে বাস করি। আমার বাড়ির পাশেই ছিল শীতলামন্দির। হঠাৎ ভোর চারটের সময় ঢাক-ঢোলের বাজনা। ঘুম ভেঙে গেল। কী ব্যাপার! সহসা ভোররাতে এই বাজনা! দেখতে দেখতে জেগে উঠল সুপ্ত অঞ্চলটা। সবাই ছুটে যাচ্ছে শীতলা মন্দিরের দিকে। আমিও গেলাম। শীতলামন্দিরের সামনে এসে যা শুনলাম তাতে আমি বিস্ময়ে ছিটকে পড়লাম। বিস্মিত ওখানে উপস্থিত অনেকেই। সবার চোখে-মুখে সঙ্কটের বিহ্বলতা।

ওই কাকভোরেও অনেক লোক জড়ো হয়েছে মন্দিরের সামনে। ক্রমশ ভিড় বেড়েই চলেছে। সবারই দৃষ্টি তখন মায়ের মূর্তির দিকে।

এ কী বিস্ময়! এ যে ভাবাও যায় না। একেই বলে জাগ্রত দেবতা। শুরু হয়েছে নানা গুঞ্জন।

কলি যুগ। ঘোর কলি। পাপে ডুবে গেছে গোটা অঞ্চল। এত পাপ সইতে পারছে না মা শীতলা। তাই তিনি কাঁদছেন। পাড়ার কী বিপদ হবে, কে জানে! এ কী অঘটন!

অঘটনই বটে! তা না হলে কেউ কি কখনও ভাবতে পারে এরকম ব্যাপার। অনেকে এ সব বিশ্বাস করে না। তারা ধরাকে সরা জ্ঞান করে। কথায় কথায় বলে কিনা এটা বিজ্ঞানের যুগ। ওসব বুজরুকি আর চলবে না।

মন্দির-কমিটির কর্তাদের সে কী বিরাট তড়পানি! গোটা পাড়া তখন তরঙ্গায়িত অভাবনীয় অলৌকিক ঘটনার আবর্তে।

পরের দিন প্রভাতি সংবাদপত্রের পাতায় ফুটে উঠল এই চাঞ্চল্যকর

সংবাদ। খবরে প্রকাশ, দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুরে একটি শীতলামন্দিরে অলৌকিক কাণ্ডকারখানা দেখা যাচ্ছে। মন্দিরে মা শীতলা কাঁদছে। কাঁদছে তার বাহন রাসভও। অবিরল অশ্রুধারা নির্গত হচ্ছে মায়ের দু'চোখ থেকে। না, কোথাও কোনও কৃত্রিম প্রণালী নেই। নিরন্তর অশ্রুধারা বয়ে চলেছে মায়ের দু'চোখে। মৃণ্ময়ী মূর্তি চিন্ময়ী রূপ ধারণ করেছে।

এই খবর শুনে এলেন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রচুর লোক। শেষ পর্যন্ত এলেন থানার ওসি। তিনি পরীক্ষা করে দেখলেন ব্যাপারটা পুরোপুরি মিথ্যে। সাজানো। তিনি বিরক্ত হয়ে দর্শনার্থীদের বললেন, আপনারা অযথা আপনাদের সময় নষ্ট করছেন। বরং যে যার কাজে চলে যান।

ব্যাপারটা কী ছিল?

আসলে সামনেই ছিল শীতলাপুজো। নতুন রঙে চকচক করছে মায়ের মূর্তি। অত্যুজ্জ্বল মারকারি আলো পড়েছে মা শীতলার চোখে-মুখে। সেই চিকচিকে রঙের উপর ঝলকানো আলোকছটায় জ্বলজ্বল করছে মায়ের দুটি চোখ। মনে হয় যেন ছলছল করছে চোখ দুটি। আর গাধার চোখের কোণে তুলি দিয়ে টানা ভার্নিশ রেখা। দেখলে মনে হয় শুকিয়ে যাওয়া চোখের জল। মায়ের ছলছল চোখ আর গাধার ওই অশ্রুরেখা দেখিয়ে সবসময় একই মিথ্যে কথার পুনরাবৃত্তি চলছে। বলা হচ্ছে, একটু আগে মা কাঁদছিল। কাঁদছিল গাধাও। ওই তো এখনও ছলছল করছে মায়ের চোখ। আর ওই যে গাধার চোখের কোণে শুকনো অশ্রুরেখা। অথচ একটি প্রাণীও কিন্তু শীতলার চোখের জল ও গাধার ক্রন্দন দেখেনি। তবুও অনেকে বলে চলেছে, পাপ — পাপেই পাড়ায় আজ এই অবস্থা। পুলিশ-অফিসার বললেই হল ব্যাপারটা কিছু না। পাশের বাড়িতে মারাত্মক বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়েছে একটি ছেলে। ওই বাড়ির বুড়িমাও প্রায় যায়-যায়।

এই অঘটনের কারণ অপর পুরুষের সঙ্গে নকুলের বউ-এর পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা। এই পাপের জন্যই মা কাঁদছে আর পাড়ায় এই বিপদ দেখা দিয়েছে।

এই অবৈজ্ঞানিক চিন্তা কি ভাবা যায়, না ভাবা উচিত! গান্ধীজির উদ্ভট কাণ্ডকারখানা দেখে এই রকম বহু ঘটনার কথাই মনে আসে। এই আদিম

চিন্তাধারায় কি কোনও দেশের অগ্রগতি হয়? রকেটের যুগে কি কেউ গোরুর গাড়ির কথা ভাবতে পারে? গান্ধীজির চিন্তাভাবনা কিন্তু সেরকমই ছিল। তাঁর এই পাগলামির নামই গান্ধীবাদ। গান্ধীজির আরও কিছু অবাস্তব চিন্তাধারা আর আবোল-তাবোল কথা এখানে তুলে ধরছি ঃ

'.....ধরো, স্বামীর সামনে তার স্ত্রী যদি কোনও দুর্বৃত্ত দ্বারা আক্রান্ত হয়, সেক্ষেত্রে স্বামী বেচারা কী করবে? কী করা উচিত?

সাধারণ বুদ্ধিতে আমরা বুঝি, স্বামী নিশ্চয়ই বাধা দেবে। দরকার হলে তাকে শক্ত আঘাত করবে। কারণ, স্বামী হিসেবে স্ত্রীর মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব সম্পূর্ণ তার। যে স্বামী তার স্ত্রীর মর্যাদা রক্ষায় অপারগ, সে তো পুরুষ নামের অযোগ্য।

গান্ধীজির অহিংসা কিন্তু তা বলে না। তাঁর বক্তব্য, তুমি অহিংস পন্থায় সাহসের সঙ্গে বাধা দিতে পারো, দরকার হলে নিজের প্রাণ দিতে পারো। তবু দুর্বৃত্ত হলেও তাকে আঘাত করা চলবে না।

এখানেই শেষ নয়। আরও আছে। একজন কংগ্রেস-কর্মী হিসেবে তুমি ব্যায়ামাগারে গিয়ে নানাবিধ আত্মরক্ষার কৌশল আয়ত্ত করবে, ওইটি চলবে না। তাতে হিংসাত্মক কাজের বাসনা বৃদ্ধি পাবে।' (গান্ধীজী ও নেতাজী ঃ শৈলেশ দে — পৃ. ১১৫)।

অহিংসার কী চমৎকার ব্যাখ্যা! গান্ধীজির এই অহিংসার ব্যাখ্যা কার্যকরী হলে বক্সিং, কুস্তি, ব্যায়াম, ক্যারাটে প্রভৃতি সবই বন্ধ করে দিতে হয়। অর্থাৎ, খেলাধূলাই বন্ধ হওয়া উচিত। অহিংসার এই অদ্ভুত ব্যাখ্যা পাগলামি ছাড়া কিছু নয়। এটা কোনও নীতি বা আদর্শ হতে পারে না।

গান্ধীজির এই অহিংসার ব্যাখ্যা সেদিন প্রচণ্ড বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল দেশবাসীর মনে। এমনকী কংগ্রেসের প্রথম সারির বহু নেতা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। সেই কথাই তুলে ধরছি এখানে ঃ

'শ্রীযুক্ত মুন্সীর কংগ্রেস ত্যাগ।

বোম্বাইয়ের খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা শ্রী কে এম মুন্সী কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেছেন। গান্ধীজী শ্রী ভোগীলাল লালার নিকট এক পত্রে লেখেন যে, যে সব কংগ্রেস-কর্মী হিংস্রভাবে প্রতিরোধ করার পক্ষপাতী, তাঁদের কংগ্রেস ত্যাগ করে নিজ নিজ বুদ্ধি-বিবেচনা মতো কাজ করতে

হবে। তা ছাড়া হিংস্রভাবে বাধা দেওয়ার কৌশল যে সব ব্যায়ামশালায় শিক্ষা দেওয়া হয়, তার সঙ্গেও কোনও কংগ্রেস-কর্মী সম্পর্ক রাখতে পারবেন না।

শ্রীযুক্ত মুন্সী এই সব বিধি-নিষেধ মেনে চলতে অক্ষম বলে জানিয়েছেন এবং কংগ্রেস থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। তিনি বলেছেন, যদি প্রাণ, ধর্মস্থান, গৃহ ও নারীর সম্মান গুণ্ডাদের হাতে বিপন্ন হয়, তবে আত্মরক্ষার জন্য যে কোনও ভাবেই হোক না কেন, তাতে বাধা দেওয়া আমি সবচেয়ে বড় কর্তব্য বলে মনে করি। খবর পাওয়া গেছে, দিল্লির কংগ্রেস-কর্মী পণ্ডিত ইন্দ্রও অনুরূপ কারণে কংগ্রেস ত্যাগ করেছেন।

গান্ধীজীর অহিংসার এই সব কড়াকড়ি শর্তে বিশ্বাসী কংগ্রেস সভ্য কতজন আছেন জানি না। পশম বাছতে কম্বল উজাড় হবে না তো? সে যাই হোক, অহিংসার চালুনীতে কংগ্রেসকে যেভাবে ছাঁকা হচ্ছে, তাতে আশঙ্কা হয়, কংগ্রেস শেষ পর্যন্ত একটা সাধু-সংঘে পরিণত না হয়ে পড়ে।' (সাপ্তাহিক দেশ ঃ ১৯৪১ সাল)।

আসলে কংগ্রেসকে প্রায় সেই রকম অকেজো করে ফেলেছিলেন গান্ধীজি। মনে হয় এই জন্যই তিনি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কোনও রাজনৈতিক নেতা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে রাজনীতি করেন বলে আমার জানা নেই। চিরদিনের জন্য রাজনীতি ছেড়ে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ঋষি অরবিন্দ। রাজনীতি আর আধ্যাত্মিকতা কি একসঙ্গে চলতে পারে?

ধর্মকে রাজনীতির মধ্যে ঢোকানোর জন্য আজ বিজেপিকে দোষারোপ করা হয়। কিন্তু গান্ধীজি তো বহু আগেই এই কাজটি করেছেন। ধর্ম আর রাজনীতিকে নিয়ে তিনি জগাখিচুড়ি পাকিয়েছেন। একই ব্যাপারে বিজেপি দোষী হলে গান্ধীজি সাধুপুরুষ হন কী করে? গান্ধীজির এরকম উদ্ভট চিন্তাধারার জন্য দেশের স্বাধীনতা যথাসময়ে আসেনি। আমাদের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি পিছিয়ে যাবার মূলেই গান্ধীজি। তাঁর উচিত ছিল রাজনীতি ছেড়ে আশ্রম নিয়ে পড়ে থাকা।

এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের একটি উক্তি তুলে ধরছি ঃ

'গান্ধী-শিষ্যরা কোনওদিনও তাঁকে রাজনৈতিক নেতা হিসেবে দেখেননি। সাধুসন্তদের লোকে যে চোখে দেখে থাকে, তাঁরাও গান্ধীজিকে

সেই দৃষ্টিতেই দেখেছেন। কংগ্রেসের উচ্চতম থেকে নিম্নতম পর্যন্ত সবার কাছে গান্ধীজি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে একজন সাধুপুরুষ। তাঁর সঙ্গে তর্ক করা চলে না। নতমস্তকে তাঁর নির্দেশ পালন করতে হয়, এই ছিল কংগ্রেস নেতা এবং কর্মী সবার মনের ভাব।'

যা আগেও বলেছি এবং এখনও বলছি সেটা হল গান্ধীজি ছিলেন অত্যন্ত চতুর। তিনি চাইতেন ভারতের একনম্বর নেতা হতে। মহাত্মা হতে। মহামানব হতে। জাতির জনক হতে। এককথায় অনেক কিছু হতে। এই পাগলামির জন্যই তিনি নিহত হয়েছিলেন। এবং দেশকেও অনেক পিছিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। কংগ্রেসেরও কম ক্ষতি হয়নি তাঁর এই অবাস্তব চিন্তাভাবনার জন্য। গান্ধীজির বিচিত্র অহিংস নীতি আর বারবার ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রত্যাহারের ফল হয়েছিল মারাত্মক।

১৯২১ সালে যে কংগ্রেসের সভ্যসংখ্যা ছিল প্রায় এক কোটি, কমতে কমতে সেই সংখ্যা এসে দাঁড়াল মাত্র দু'লক্ষে।

গান্ধী-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হল আজ তিনি যা বলছেন কালই তার বিপরীত কথা শোনাচ্ছেন। এতে মানুষ বহুবার বিভ্রান্ত হয়েছে। আমাদের দেশের মতো কুসংস্কারাচ্ছন্ন গরিব ভাববাদী দেশে যার গায়ে যত বেশি ধর্মের তকমা থাকবে তিনি তত বেশি জনপ্রিয়। তাই বেশিরভাগ অশিক্ষিত মানুষ গান্ধীজিকে দেবতা ভাবতেন। ফলে তিনি তাঁর জনপ্রিয়তার সুযোগ নিয়ে নানারকম অপকর্ম করে যেতেন।

এমনকী তাঁর মানসপুত্র প্রিয়তম শিষ্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুও তাঁর অহিংস নীতির সমালোচনা করেছেন। অহিংসা ভালো — খুবই ভালো। কিন্তু সব ক্ষেত্রে গান্ধীজির এই অহিংসা মানা যায় না। একজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খেয়ে মরবে, তবু সে নিজেকে রক্ষা করার জন্য আঘাত করবে না — এটা একটা অবাস্তব চিন্তা। নেহরু এই রকম অহিংসা মানতে রাজি নন।

'তারিখটা ছিল ১৯৩২ সালের ৮ই এপ্রিল।

অসহযোগ আন্দোলনের বন্দী হিসেবে জওহরলাল তখন কারাগারে। ওদিকে জাতীয় সপ্তাহ উপলক্ষে মাতা শ্রীমতি স্বরূপরানী নেহরু এক মিছিল নিয়ে এগিয়ে চলেছেন এলাহাবাদের রাজপথ দিয়ে। সহসা লাঠি-চার্জ। ফলে গুরুতর ভাবে তিনি আহত হলেন পুলিসের লাঠির ঘায়ে।

খবর শুনে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন জওহরলাল। হওয়াটাই স্বাভাবিক। মা পুলিশের হাতে প্রহৃতা হয়েছেন — এ খবরে যে কোনও সন্তানেরই উত্তেজিত হওয়ার কথা। আত্মজীবনীতে এ প্রসঙ্গ উল্লেখ করে নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করেছেন পণ্ডিত জওহরলাল, আমার চোখের সামনে এ ঘটনা ঘটলে তখন আমার পক্ষে অহিংস থাকা সম্ভব হত কি?'

(গান্ধীজি ও নেতাজী ঃ শৈলেশ দে — পৃ. - ১১৬-১১৭)।

অসংলগ্ন নেতা

গান্ধীজি কোনও কথা শুনতে নারাজ। তাঁর পরিষ্কার কথা ঃ

'অহিংসা যদি বীরের অহিংসা না হয়ে দুর্বলের অহিংসা হয় এবং তা যদি হিংসার সামনে নতজানু হয়, তবে গান্ধীবাদের ধ্বংস হওয়া উচিত।'

ঠিক তাই হয়েছে। হয়নি কি গান্ধীবাদের ধ্বংস? কে আজ গান্ধীবাদ মেনে চলে! কংগ্রেসিরাই কি মানে? আজ কংগ্রেসিদের মধ্যে তো কাটাকাটি-ফাটাফাটি লেগেই আছে। ক'জন কংগ্রেসি আজ গান্ধীবাদি? গান্ধীবাদ আজ অচল।

কী ঘটেছিল সেদিন দেশ স্বাধীন হবার পর? গান্ধীজির সামনেই তো সব ঘটল একের পর এক। দেশ-বিভাগ হল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য। এটা ভেবেছিলেন গান্ধীজি এবং কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ। তাঁদের এই ধারণাই ভুল প্রমাণিত হল। দেশ-বিভাগের আগে ও পরে গান্ধীবাদ পুরোপুরি ব্যর্থ।

দেশ-বিভাগের আগেও যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলেছিল, পরেও তা চলতে থাকল। কে শোনে তখন গান্ধীজির বিচিত্র অহিংসার বাণী! গান্ধীনীতি কেউ মানে না, মানতে চায় না। ওই সব উদ্ভট কথা কেউ আর শুনতেও চায় না। দেশবাসী প্রচণ্ড বিরক্ত হয়েছিল গান্ধীজির উপর।

দেশ-বিভাগ হয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আরও বেশি জটিল ও ক্ষতিকর হয়েছে। কারণ, দেশভাগ হয়েছিল হিন্দু-মুসলমানের শত্রুতার উপর ভিত্তি করে।

'Can anyone deny that the creation of Pakisthan has not solved the communal problem, but made it more intense and harmful? The basis of partition was enmity between Hindus and Muslims'. (India Wins Freedom : Abul Kalam Azad — P.-226).

দেশ-বিভাগের পর সর্বত্র একই অবস্থা। লুণ্ঠন, হত্যা আর অগ্নিসংযোগ। খুন চাই। খুনের বদলে খুন।

গান্ধীজি আবেদন জানাতে লাগলেন বারবার। তোমরা এরকম কোরো না। শান্ত হও। ভ্রাতৃহত্যা মহাপাপ। হিন্দু-মুসলমান তখন পরস্পরের শত্রু। কে কার ভাই? কেউ কর্ণপাত করল না গান্ধীজির কথায়।

'Gandhiji's distress was increasing everyday. Formerly, the whole nation had responded to his slightest wish. Now it seemed that his most fervent appeals were falling on deaf ears.'

(Ibid : P.-215).

গান্ধীজির কথা আজ আর কেউ শোনে না। একদিন তাঁর কথায় গোটা দেশের মানুষ উঠত-বসত। কিন্তু এখন! এখন গান্ধীজির সব কথাই অর্থহীন। গান্ধী-নীতিও কেউ মানে না।

পরিস্থিতি লক্ষ্য করে গান্ধীজি নিজেই তখন ক্ষুব্ধ অশান্ত। টের পেলেন ওই জটিল অহিংস নীতি কেউ বিশ্বাস করে না ও মানে না।

সত্যিই এই অদ্ভুত অহিংস নীতি কারও বোধগম্য হত না। গোটা দুনিয়ার কাছে এটা ছিল একটা হেঁয়ালির মতো। এমনকী কংগ্রেসিরাও এটাকে মেনে নিতে পারেনি। এই বিষয়ে আগেই বলেছি — ১৯২১ সালে যে কংগ্রেসের সভ্যসংখ্যা ছিল প্রায় এক কোটি, কমতে কমতে সেই সংখ্যা এসে দাঁড়াল মাত্র দুই লক্ষে।

ইতিপূর্বে বিশিষ্ট কিছু কংগ্রেস-নেতা এবং সভ্যদের কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে যাবার কথা বলেছি। বাকি যে সব নেতা কংগ্রেসেই ছিলেন তাঁরাও কিন্তু বেশিরভাগই গান্ধীজির অহিংস নীতি মেনে চলেননি। এ প্রসঙ্গে নাথুরাম গড্‌সের 'শুনুন ধর্মাবতার' গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ তুলে ধরছি :

'৮০। ১৯৪২ সালের ৮ই আগস্ট গান্ধীজির নেতৃত্বে কংগ্রেস যখন

'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন শুরু করল, তখন ভারত সরকার অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতাদের গ্রেপ্তার করে নিল — তাঁরা আন্দোলন শুরু করবারও অবকাশ পেলেন না। এতদূর পর্যন্ত আন্দোলন ছিল অহিংস এবং তা সমূলেই বিনষ্ট হল। কিন্তু কংগ্রেসেরই এক অংশ আত্মগোপন করল।

এঁরা গান্ধীকৌশল অনুসরণে অতি আগ্রহী ছিলেন না — জেলে গিয়ে বসে থাকবার মানসিকতাও এঁদের ছিল না। এঁদের ইচ্ছেটা ছিল ঠিক উল্টো। এঁরা যত বেশিদিন সম্ভব জেলের বাইরে থাকা আর সেই সময়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, সহিংস নানা কাজ করে, প্রয়োজনে খুনও করে সরকারকে যতখানি সম্ভব ক্ষতিগ্রস্ত করার ইচ্ছা পোষণ করতেন। গান্ধীজি জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করতে ওই যে 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' মন্ত্র দিয়েছিলেন, এঁরা তার ব্যাখ্যা করলেন যে, গান্ধীজী অন্তর্ঘাতমূলক সব রকম কাজ করবার অনুমতি দিয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে তাঁরা সরকারের যুদ্ধোদ্যম স্তব্ধ করে দেওয়ার মতো যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন — পুলিশথানা পুড়িয়ে দিয়েছিলেন, ইচ্ছাকৃতভাবে ডাক যোগাযোগ ছিন্ন করা হয়েছিল। উত্তর বিহার এবং অন্যান্য স্থান মিলিয়ে প্রায় ৯০০ রেলস্টেশন হয় পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, নয় ধ্বংস করা হয়েছিল। শাসনযন্ত্র কিছুকালের জন্য একেবারে নিশ্চল হয়ে গিয়েছিল।

৮১। এসব কাজ কংগ্রেসের অহিংসা ও সত্যাগ্রহ কৌশলের সম্পূর্ণ বিপরীত মার্গের ছিল। এ কাজগুলো গান্ধীজী সমর্থনও করতে পারলেন না, বিরোধিতা করতেও পারলেন না। যদি তিনি সমর্থন করেন তবে তাঁর অহিংসার নীতি ধ্বসে পড়ে, আর যদি প্রকাশ্যে বিরোধিতা করেন তবে জনপ্রিয়তা হারাবেন। কারণ, দেশ থেকে ব্রিটিশের উৎখাত যদি হয়, তবে তা সহিংস বা অহিংস কোন পথে হল তা নিয়ে জনগণ মাথা ঘামায় না।

প্রকৃতপক্ষে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন কংগ্রেস সমর্থকদের হিংসাত্মক কাজের জন্যই খ্যাত, অন্য কোনও কারণে নয়। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন শুরু হওয়ার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই অহিংস নীতির মৃত্যু হয়, আর তারপর থেকে ওই আন্দোলনে যে হিংসাত্মক ক্রিয়াকর্ম চলে তা গান্ধীজীর প্রীতিচ্যুত হয়। ১৯৪২ সালের ১৮ আগস্টের পর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই কংগ্রেস

দলের ও তাদের সমর্থকদের কাজকর্মের মধ্যে গান্ধীনীতির নামগন্ধও খুঁজে পাওয়া যায় না। এই কর্মকাণ্ডের সমর্থকদের দীক্ষায় বা কর্মে অহিংসার ছিঁটেফোঁটাও দেখা যায় না। গান্ধীজীর কথার অনুসরণে বলা যায় যে তাঁরা কর্মসাধন বা শরীর পতনের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন।'

গান্ধীজির অহিংস নীতি এখানে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হল। এই ভাবে প্রায় সর্বত্রই তাঁর অদ্ভুত অহিংস নীতি ব্যর্থ হয়।

ব্রিটিশকে বিতাড়িত করাটাই যেখানে ভারতবাসীর উদ্দেশ্য, সেখানে গান্ধীজির পাগলামি কেন তারা মেনে নেবে? তাই তো আবুল কালাম আজাদ তাঁর 'India Wins Freedom' গ্রন্থে 'ভারত ছাড়ো' এই অধ্যায়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে অরুণা আসফ আলির বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। তখনকার গান্ধীবাদী কংগ্রেস নেত্রী অরুণা আসফ আলি যে আত্মগোপন করে ৯ আগস্টের পর থেকে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের নেতৃত্বের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, একথা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। তাঁর সম্বন্ধে আজাদের বক্তব্য — 'She was not worried about the distinction between violence and non-violence but adopted any method she found useful.' (Complete Version (1988) Page-124).

গান্ধীজির এই উদ্ভট অহিংস নীতি মনেপ্রাণে বড় একটা কেউ মেনে নেননি। কংগ্রেসের নেতারাও না।

চৌরিচৌরার ঘটনায় পুরো আন্দোলনটা বন্ধ করে দিলেন গান্ধীজি।

জেল থেকে প্রতিবাদ জানালেন লালা লাজপত রায়, মতিলাল নেহরু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ।

ভারতবর্ষে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে কে কোথায় সহিংস হয়েছিল, আর তার জন্য পুরো আন্দোলনই বন্ধ! এ কী অদ্ভুত কথা! এ তো আন্দোলনের নামে প্রহসন। ব্রিটিশেরই পোয়াবারো। তারা জানত গান্ধীজিই তাদের শ্রেষ্ঠ বন্ধু। গান্ধীজির মতো আরও কিছু বন্ধু থাকলে ব্রিটিশ আরও অনেকদিন ভারতে থাকতে পারত। গান্ধীজির এই আচরণে জওহরলাল নেহরু তখন রীতিমতো ক্ষুব্ধ। 'এই যদি পরিণতি হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে, আমাদের এই অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে কোথাও কোনও ত্রুটি রয়েছে।'

'If this was the inevitable consequence of a sporadic act of violence, then surely there was something lacking in the philosophy and technique of a non-violent struggle.' (An Auto Biography : P.-82).

জওহরলাল আরও বলেছেন ঃ 'পুলিশের অনেক গুপ্তচর, এজেন্ট, প্রভোকেটর আছে। তারা যদি কৌশলে আমাদের এই আন্দোলনের মধ্যে হিংসা ঢুকিয়ে দেয়, তা হলেও কি আন্দোলন প্রত্যাহার করতে হবে? এরকম হলে এই অহিংস আন্দোলন কোনওদিনই সাফল্য লাভ করতে পারবে না।'

পারেওনি। পারা সম্ভব নয়। আন্দোলন চলছিল দেশের স্বাধীনতার জন্য। সাম্রাজ্যবাদী শত্রু ব্রিটিশ শান্তির ললিত বাণী শুনে দেশ ছেড়ে চলে যাবে — এটা ভাবা পাগলামি ছাড়া কিছু নয়। এই পাগলামি গান্ধীজি সারা জীবন ধরে করে এসেছেন। তাই শেষ পর্যন্ত তাঁর কাছে অনেকেই থাকেনি।

১৯৪৮ সাল। দেশ-বিভাগের পরও হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বন্ধ হল না। গান্ধীজির আবেদন ব্যর্থ হল। মুসলিম সমাজ গান্ধীজিকে সমর্থন করেনি। সমর্থন করল জিন্নাকে।

কী অদ্ভুত ব্যাপার! যে মুসলিম সমাজ গান্ধীজিকে সমর্থন করল না, গান্ধীজিকে প্রাণ দিতে হল কিন্তু সেই মুসলিম তোষণের জন্য। তাঁদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য গান্ধীজি সব রকম প্রচেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁরা গান্ধীজির দিকে ফিরেও তাকাননি। গান্ধীজির এই অদ্ভুত আচরণে হিন্দুরাও তাঁর কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেলেন। সরে গেলেন বহু কংগ্রেস নেতাও।

১৯৪৮ সালে জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে জয়প্রকাশ নারায়ণকে সঙ্গে নিয়ে গান্ধীজি দিল্লি গেলেন। গান্ধীজি যেখানেই যেতেন তাঁর অভ্যর্থনার ত্রুটি হত না। সাধারণ লোক তো তাঁকে দেখার জন্য ভিড় করত। উপস্থিত থাকতেন কংগ্রেস নেতা ও কর্মীরা। কিন্তু সেদিন দিল্লি রেলস্টেশনে কোনও কংগ্রেস নেতাই উপস্থিত ছিলেন না তাঁকে সংবর্ধনা জানানোর জন্য। তাঁরা গান্ধীজির আচরণে এত বেশি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে, তাঁর প্রতি কোনও সৌজন্য প্রদর্শনই প্রয়োজন মনে করেননি।

'In the first week of January, 1948, Gandhi proceeded to Delhi accompanied by Jayaprakash. There was no Congress

leader present at the Delhi Railway Station to receive Gandhi, such was the situation.' (J.P. : Dr. Amarnath Seth, P-10).

সুচতুর গান্ধীজির ধর্ম আর রাজনীতি নিয়ে ছেলেখেলার এটাই ছিল অনিবার্য পরিণাম। তা ছাড়া মুসলিম তোষণ নিয়েও তাঁর বাড়াবাড়ি ছিল সীমাহীন। তাতেও তিনি মুসলিমদের মন জয় করতে পারেননি। উল্টে মুসলিম সমাজ তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছে। খিলাফৎ আন্দোলনও তার অন্যতম প্রমাণ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে তুরস্কের সুলতানের অধিকার খর্ব করা হয়। কারণ, তিনি জার্মানির পক্ষে যোগদান করেছিলেন। তুরস্কের তখন বড় দুর্দিন। আফ্রিকা এবং মধ্য প্রাচ্যের সব সাম্রাজ্যই তার হাতছাড়া। ইউরোপেও তার রাজকীয় সম্মান আর নেই। তরুণ তুর্কীরা সুলতানকে সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য করে। সুলতানের অবলুপ্তির পর খিলাফৎও লুপ্ত হয়। ভারতীয় মুসলিমরা খিলাফতে ভক্তিমান। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল সুলতান এবং খিলাফতের পতন ঘটিয়েছে ব্রিটেনই। তাই তারা খিলাফতের পুনরুজ্জীবনের জন্য আন্দোলন শুরু করে। গান্ধীজি ভাবলেন এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হলে মুসলমানদের মন জয় করা যাবে। একেবারে অবাস্তব ভুল চিন্তা। তিনি একবারও ভাবলেন না মৌলবাদীদের প্রশ্রয় দেওয়া আদৌ উচিত নয়। এরা সাপের মতো ক্রূর। পোষ মানে না। উলটে ছোবল মারে। সেই কথাই তুলে ধরছি এখানে শৈলেশ দে'র 'গান্ধীজি ও নেতাজি' গ্রন্থ থেকে ঃ

'১৯২০ সালে তিনি (গান্ধীজি) খিলাফৎ আন্দোলন শুরু করেছিলেন দুই মুসলিম নেতা সৌকত আলী ও মহম্মদ আলীকে সঙ্গে নিয়ে।

সেদিন খোলাখুলি ভাবেই তিনি বলেছিলেন — আলী ভ্রাতৃদ্বয় হল আমার দুই ভাই। আমার দুটি হৃদপিণ্ড।

যদিও খিলাফৎ আন্দোলনের মধ্যে স্বাধীনতার কোনও প্রশ্নই ছিল না। সবেমাত্র প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে। জার্মানির পক্ষে যোগ দেবার অপরাধে তুরস্কের সুলতানের অধিকার কিছুটা খর্ব করা হয়েছে। স্বভাবতই ভারতীয় মুসলমানগণ ব্রিটিশের এই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত। তাঁদের দাবি — তুরস্কের সুলতানের অধিকার কোনওমতেই খর্ব করা চলবে না। এই নিয়ে আন্দোলন।

কেউ কেউ সেদিন প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন এই নিয়ে। তাঁদের বক্তব্য, ব্যাপারটা পুরোপুরি তুরস্কের। তাদের সুলতানের অধিকার খর্ব হোক বা না হোক, তাতে ভারতের কী আসে যায়? ভারত কেন নিজের কথা না ভেবে এই আন্দোলনকে গ্রহণ করবে জাতীয় আন্দোলনরূপে? তাতে ভারতের লাভ কী?

আসলে এই খিলাফৎ আন্দোলন হল বিশ্বে মুসলিম ক্ষমতা বিস্তারের প্যান-ইসলামিক আন্দোলন। এ ইস্যু নিয়ে আন্দোলন করার অর্থই হল সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে প্রশ্রয় দেওয়া।

কারও পরামর্শেই কান দেননি গান্ধীজি। তাঁর এক কথা 'খিলাফৎ আন্দোলন চলবেই। তার জন্য যদি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবিকে পিছিয়ে দিতে হয়, তাতেও আমি রাজী।' (পৃ. ১৫৮-১৫৯)।

পরাধীন দেশের কাছে স্বাধীনতার চেয়ে বড় জিনিস কিছুই হতে পারে না। অথচ গান্ধীজি বারবার এই স্বাধীনতার ব্যাপারে আবোল-তাবোল কথা বলছেন। ইতিপূর্বে সে কথা উল্লেখ করেছি। পরেও আবার বলব। গান্ধীজির জন্যই দেশ-বিভাগ হল। স্বাধীনতাও বিলম্বিত হয়েছে। তাঁর এই ধরনের কথায় মনে হয়েছে ভারতবর্ষ যেন তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি। তা নিয়ে তিনি যা-খুশি তাই করতে পারেন। অন্য কারও কথা শুনতে তিনি রাজি নন।

....'কিন্তু কেন? যে আন্দোলনের পেছনে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার কোনও প্রশ্ন নেই, তার জন্য গান্ধীজির কেন এই অনমনীয় সিদ্ধান্ত? কী এর কারণ?

কারণ আর কিছু নয়, আসলে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল — এই খিলাফৎ আন্দোলনের মাধ্যমে বৃহত্তর মুসলিম সমাজকে কাছে টেনে আনা। তাদের সংগ্রামের পথে পা বাড়াতে সাহায্য করা।

গান্ধীজির এই আন্তরিক প্রচেষ্টা ফলবতী হয়েছিল কী?

না, হয়নি। বরং ক্ষতি হয়েছিল বিস্তর। যে আলী-ভ্রাতৃদ্বয়কে একদিন তিনি ভাই বলে বুকে টেনে নিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে তাদের মুখেই আবার শোনা গিয়েছিল বিপরীত কথা, যার সঙ্গে অহিংসা তো নয়ই, এমনকি শালীনতার পর্যন্ত কোনও প্রশ্ন ছিল না।

যেমন মহম্মদ আলীর উক্তি, 'আমি আগে মুসলমান, তারপর ভারতীয়

...... মুসলিম রাষ্ট্র আফগানিস্তান যদি ভারত আক্রমণ করে, তাহলে আমি তাদের সাহায্য করব। হিন্দুরা তাতে বাধা দিলে তাদের বিরুদ্ধেই আমি যুদ্ধ করব। ..... গান্ধীকে যেদিন আমি মুসলিম ধর্মে দীক্ষিত করতে পারব, সেদিনই হবে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন।'

শুধু কি তাই! ১৯৩০ সালে শুরু হল গান্ধীজির ঐতিহাসিক আইন-অমান্য আন্দোলন।

সঙ্গে সঙ্গে এক বিবৃতি দিয়ে মুসলিম সমাজকে সতর্ক করে দিলেন মহম্মদ আলী। 'খবরদার! তোমরা যেন গান্ধীর কথায় বিভ্রান্ত হয়ো না। কেউ তোমরা যোগ দিও না গান্ধীর এই আন্দোলনে।' (পৃ. ১৫৯-১৬০)।

কী অহিংসা, কী হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি — সব ক্ষেত্রেই গান্ধীজি ব্যর্থ। কারণ, তাঁর অহংসর্বস্ব ভাব। মানে আমি যা ভাবব, আমি যা করব, সেটাই ঠিক। অন্যরা ভুল। এই অহমিকার জন্য তিনি বারবার ডুবে গেছেন।

সব ব্যাপারেই গান্ধীজির বাড়াবাড়ি ছিল সীমাহীন। 'আলী ভ্রাতৃদ্বয় হল আমার দুই ভাই। আমার দুটি হৃদপিণ্ড।' এতটাই তোল্লা দিয়েছিলেন তিনি তাঁদের। ভেবেছিলেন এতেই হয়তো আলী-ভ্রাতৃদ্বয়ের মন জয় করা যাবে। তাহলেই তিনি হয়ে উঠবেন মুসলিম সমাজেরও নেতা। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ই তাঁর কথা মতো চলবে। ভুল, একেবারেই ভুল। উলটে তাঁরা গান্ধীজিকে পাত্তাই দিলেন না। এমনকী মহম্মদ আলী বললেন, 'গান্ধীকে যেদিন আমি মুসলিম ধর্মে দীক্ষিত করতে পারব, সেদিনই হবে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন।'

গান্ধীজির এই শঠতার জন্যই তাঁর ছেলে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। পিতাপুত্রের সম্পর্কও ছিন্ন হয়েছিল। মুসলিম সমাজকে হাতে আনার জন্য তাঁর মুসলিম তোষণ নীতি যে দেশের কী সাংঘাতিক ক্ষতি করেছে সেই কথাই তুলে ধরছি : '.... মুসলিম লীগ-প্রধান জিন্না সাহেবের কাছেও গান্ধীজি কম আবেদন করেননি হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির জন্য। এমনকি গোলটেবিল বৈঠকে ব্ল্যাঙ্ক চেক পর্যন্ত দিতে চেয়েছিলেন জিন্না সাহেবকে, কিন্তু তাতেও বরফ গলেনি।

অনেকের মতে, এই অতিরিক্ত জিন্না তোষণ নীতির ফলে লাভ তো হয়ইনি, বরং ক্ষতি হয়েছে প্রচুর। ঐক্য তো দূরের কথা, বরং এই তোষণ-

নীতির ফলে দিনকে দিন দাবির মাত্রা বেড়ে গেছে জিন্না সাহেবের। তাই বোধহয় পরবর্তীকালে ব্রিটিশ ভাষ্যকার মোসলে বলেছিলেন, 'গান্ধীজি বুঝতে পেরেছিলেন যে, স্বাধীনতার আসল চাবিকাঠিটি রয়েছে জিন্নার হাতে এবং সে চাবি তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন তিনি নিজেই।'

প্রথম সারির কংগ্রেস নেতা মৌলানা আবুল কালাম আজাদ জিন্না সম্বন্ধে গান্ধীজির এই কার্যাবলী দেখে খুশি হতে পারেননি। তিনি বলেছেন, 'জিন্না সম্বন্ধে গান্ধীজির মনোভাব বরাবরই দুর্বোধ্য ছিল। কংগ্রেস ত্যাগ করার ফলে জিন্নার রাজনৈতিক গুরুত্ব খুবই কমে গিয়েছিল, কিন্তু গান্ধীজির ভ্রান্ত কার্যকলাপের দরুন জিন্না আবার রাজনীতির ক্ষেত্রে গুরুত্ব অর্জন করতে সক্ষম হন।'

'Gandhiji had in fact adopted a peculiar attitude to Jinnah from the very beginning. .... It was largely due to Gandhiji's act of commission and omission that Mr. Jinnah regained his importance in Indian political life.' (India Wins Freedom : P.-93)।

এখানেই থামেননি তিনি। আরও বলেছেন, 'ভারতবর্ষের মুসলিম সমাজের একটা বড় অংশ জিন্না ও তাঁর কার্যাবলীকে বরাবরই সন্দেহের চোখে দেখত। কিন্তু তারা যখন দেখতে পেল গান্ধীজি অনবরত তাঁর পেছনে ছুটছেন, নানাভাবে তাঁকে তোয়াজ করছেন, তখন তারাই আবার জিন্নাকে অন্য চোখে দেখতে শুরু করল। তাদের বিশ্বাস হল, জিন্নাই তাদের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে যোগ্যতম ব্যক্তি।'

'কায়েদ-ই-আজম' (মহান নেতা) জিন্না। ....এই 'কায়েদ-ই-আজম' বিশেষণটি স্বয়ং গান্ধীজিরই দেওয়া। এটাও সমর্থন করতে পারেননি আজাদ সাহেব। তাঁর বক্তব্য—'জিন্নাকে 'কায়েদ-ই-আজম' সম্বোধন করতে দেখে মুসলিম সমাজের ধারণা হল যে, স্বয়ং গান্ধীজি যাঁকে এ রকম সম্বোধন করেছেন, তিনি বুঝি সত্যিই একজন 'কায়েদ-ই-আজম' বা মহান নেতা।

'When Indian Musalmans saw that Gandhiji also addressed Mr. Jinnah as Qaid-E-Azam, they felt that he must

really be so.' তবু হাল ছাড়েননি গান্ধীজি। বারবার ব্যর্থ হয়েছেন, তবু আবার আকুল আবেদন করেছেন...' (পৃ. ১৬০-১৬১)।

একেই বলে খাল কেটে কুমির আনা। কংগ্রেস ত্যাগ করার পরে যে জিন্নার রাজনৈতিক গুরুত্ব একেবারে কমে গিয়েছিল, গান্ধীজি বারবার তাঁকে তোল্লা দিয়ে জনপ্রিয় করে তোলেন। দেশের সর্বনাশ ডেকে আনেন।

গান্ধীজির এই বাড়াবাড়ির ফলেই জিন্নার দাবি ক্রমশ বেড়েই চলেছিল। তিনি গান্ধীজিকে বিশ্বাস করতেন না। তিনি সবসময়ই তাঁকে 'হিন্দু নেতা' বলতেন। মহাত্মা বা জাতির জনক কখনও বলতেন না। তাঁর বক্তব্য ছিল হিন্দু নেতা হিন্দুদেরই স্বার্থ দেখবেন, মুসলমানদের নয়। ফলে তিনি দাবি করলেন পাকিস্তান — মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য। শেষ পর্যন্ত দেশ ভাগ হল। এবং চিরশত্রু পাকিস্তানের জন্ম হল। এর জন্য কিন্তু ষোলোআনাই দায়ী গান্ধীজি। তাঁর জিন্না তোষণই দেশটাকে শেষ করে দেয়।

একটা মানুষ দেশের একনম্বর নেতা হবেন, বিশ্বপিতা হবেন, মহামানব হবেন এবং হবেন আরও অনেক কিছু। এরকম হলে তাঁর মধ্যে পাগলামি ঢুকবেই। ঢুকেও ছিল গান্ধীজির মধ্যে। তিনি ছিলেন অসংলগ্ন। পরস্পরবিরোধী কাজ করেছেন আর আবোল-তাবোল কথা সবসময় বলেছেন।

অদূরদর্শী সংগ্রামী

গান্ধীজি ছিলেন অদূরদর্শী। তিনি মহামানব সাজতে গিয়ে দেশের অনেক ক্ষতি করেছেন। মুসলিম সমাজের মন জয় করতেও ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁর ভুলের জন্য শুধু দেশ-বিভাগই হয়নি, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গাও হয়েছে। বারবার তিনি মুসলিম মৌলবাদী নেতাদের নিজের কাছে টানার চেষ্টা করেছেন। আগেই বলেছি মৌলবাদীদের স্বভাব সাপের মতো ক্রূর। এরা পোষ মানে না।

গান্ধীজি চতুর হলেও বাস্তববাদী নন। কারণ, তাঁর একই অঙ্গে বহু

রূপ। কতবার যে কত অবাস্তব কথা বলেছেন তার ইয়ত্তা নেই। হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির জন্য তিনি আলী ভ্রাতৃদ্বয় আর জিন্নার কাছে নিজেকে বহু নীচে নামিয়েছিলেন। তবুও চিড়ে ভিজল না। ফল হল শূন্য। এ ব্যাপারে আরও কিছু তথ্য তুলে ধরছি।

গান্ধী-জিন্নার যোগাযোগ ঃ

'Brother Jinnah,

There was a day when I could induce you to speak in the mother tongue. To-day I take courage to write to you in the same language. I had invited you to meet me while I was in jail. I have not written to you since my release. But to-day my heart says that I should write to you. We will meet whenever you choose. Don't regard me as the enemy of Islam or of the Muslims of this country. I am the friend and servant of not only yourself but of the whole World. Do not disappoint me.

Jinnah replied from Kashmir informing 'Mr. Gandhi' that he would be glad to receive you at my house in Bombay on my return, which will probably be about the middle of August.—vide his letter of 24th July, 1944. (Gandhi—Truth behind a veil of Mist : Niharendu Dutt-Majumdar – P.-2&3).'

অর্থাৎ—ভাই জিন্না, একদিন তোমার সঙ্গে মাতৃভাষায় কথা বলার ইচ্ছে ছিল। আজ আমি সাহস করে সেই ভাষায় লিখছি। জেলে থাকার সময় আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য তোমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। মুক্তি পাওয়ার পর তোমাকে আর কোনও চিঠি দিইনি। কিন্তু আজ আমার হৃদয় বলছে যে আমি তোমাকে চিঠি লিখি। তোমার সুবিধামতো একদিন আমরা দেখা করতেই পারি। তুমি কখনওই আমাকে এই দেশের মুসলিম বা ইসলামের শত্রু ভেবো না। আমি কেবলমাত্র তোমারই বন্ধু ও ভৃত্য নই, সারা বিশ্বেরই। আমাকে ভুল বুঝো না।

জিন্না প্রত্যুত্তরে কাশ্মীর থেকে 'মি. গান্ধী' সম্বোধন করে লিখলেন যে

'ফিরে এসে আপনাকে আমার বম্বের বাড়িতে সানন্দে ডাকব। সেটা সম্ভবত আগস্টের মাঝামাঝি। ১৯৪৪ সালের ২৪ জুলাই জিন্না এই চিঠি লিখেছিলেন।

এটা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে জিন্নাকে তোষামোদ করাই ছিল গান্ধীজির উদ্দেশ্য। তার চেয়েও বড় কথা, আগ বাড়িয়ে তিনি বলছেন 'আমাকে মুসলিম বা ইসলামের শত্রু ভেবো না।'

মৌলবাদী মুসলিম নেতাদের এইভাবে তিনি মাথায় তুলেছেন। এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন উদার মুসলিম নেতা আবদুল গফফর খান (সীমান্ত গান্ধী) এবং আবুল কালাম আজাদ। এঁরা সত্যিকারের দেশপ্রেমিক। জিন্না ও জওহরলালের মতো ক্ষমতালোভী ছিলেন না।

ইতিপূর্বে দেশ-বিভাগের ব্যাপারে আবুল কালাম আজাদের কথা জানিয়েছি। তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন দেশ-বিভাগের। গান্ধীজি তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, 'আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি দেশ-বিভাগে সম্মতি দেব না। এবং সেটা হলে হবে আমার মৃতদেহের উপর দিয়ে।'

আজাদ আশ্বস্ত হন। সত্যের পূজারী যখন এতবড় কথা বলেছেন তখন দেশ-বিভাগ হবে না। কিন্তু হায়! অচিরেই তিনি বুঝলেন গান্ধীজি তাঁকে ধাপ্পা দিয়েছেন।

একইভাবে আশাহত হলেন বাদশা খান (সীমান্ত গান্ধী)। কী করেননি তিনি কংগ্রেসের জন্য! দুর্ধর্ষ পাঠান জাতকে অহিংস মন্ত্রে দীক্ষিত করা কি চাট্টিখানি কথা! তিনি তাই করেছিলেন ভারতের স্বাধীনতার জন্য। কিন্তু কোথায় তাঁর স্বপ্নের ভারত! তিনি তো রয়ে গেলেন পাকিস্তানে। দ্বিখণ্ডিত ভারতের একটা অংশে। তিনি চেয়েছিলেন অখণ্ড ভারতের ভারতবাসী হতে, হলেন পাকিস্তানের অধিবাসী। তাঁর অজ্ঞাতসারেই গান্ধীজি তলে তলে নেহরু-প্যাটেল-জিন্নার সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভারত-ভাগ করলেন। ছুটে গেলেন বাদশা খান জাতির জনকের কাছে। ধীরস্থির ভাবে এসে দাঁড়ালেন তাঁর সামনে। তারপর বাদশা খানের করুণ কণ্ঠ থেকে ঝরে পড়ল কাতরোক্তি, বাপুজি, আপনি এ কী করলেন! আমাদের নেকড়ের মুখে ঠেলে দিলেন। 'You have thrown us to the Wolves.'

চতুর গান্ধীজি সারা জীবনই চেষ্টা করেছেন অপকর্ম করে ধরাছোঁয়ার

বাইরে থাকতে। বাদশা খান সেটা বুঝেই তাঁকে বলেছিলেন, 'আমাদের নেকড়ের মুখে ঠেলে দিলেন আপনি।'

গান্ধীজি যে দেশ-বিভাগের জন্য পুরোপুরি দায়ী, সেটা বুঝেছিলেন বাদশা খান। তাই তাঁর মুখ থেকে গান্ধীজির উদ্দেশে বেরিয়েছিল ওই উক্তি। তিনি এটাও বুঝেছিলেন গান্ধীজি তলে তলে দেশ-বিভাগের এই নোংরা খেলায় যুক্ত ছিলেন নেহরু-প্যাটেল-জিন্নার সঙ্গে। আজ এই সত্য দিবালোকের মতো স্পষ্ট। কোথাও কোনও কুয়াশার জাল নেই।

বাদশা খান বুদ্ধিমান। গান্ধীবাদী বলেই তিনি গান্ধীর চালাকি ধরে ফেলেছিলেন। নেতাজিকে কেন গান্ধীজি কংগ্রেস থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন তা আজ তাঁর কাছে স্পষ্ট। কারণ, নেতাজি জওহরলালদের মতো পোষ মানেননি। মহাবীর মহাক্ষত্রিয়কে পোষ মানানো যায় না। সেটা গান্ধীজি ত্রিপুরী কংগ্রেসেই টের পেয়ে গেছেন। কোনওভাবেই সুভাষ নিজের আদর্শ বিসর্জন দেবেন না। তা ছাড়া অন্যান্য নেতাদের তুলনায় নেতাজির জনপ্রিয়তা অনেক বেশি। তাই আক্ষেপ করে বাদশা খান বলেছেন, সুভাষের সাময়িক অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে দেশটাকে ভাগ করা হল। এটাই নাকি সাম্প্রদায়িক সমস্যার একমাত্র সমাধান বলে জনসাধারণকে ধোঁকা দেওয়া হল। নেতাজি সুভাষের ভয়ে নেহরু ও জিন্না তাড়াতাড়ি তাঁদের হাতে শাসন ব্যবস্থা তুলে নিয়ে দু'জনেই ব্যর্থতার পরিচয় দিলেন।

'On the basis of communal feelings once in momentary absence of Subhas, India was divided giving bluff-solution of it, to the Nation, ... being so much so afraid of Netaji Subhas that he might come out one day in this subcontinent, both Mr. Nehru and Mr. Jinnah sat together on the throne and lastly they proved themselves inefficient.' (Times of India : 6.4.70)

গান্ধীজি দেশ-বিভাগের ব্যাপারে দোষারোপ করেছেন তাঁর সহকর্মীদের। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। সবার আগে তিনিই তো দেশ-বিভাগের জন্য মত দিয়েছিলেন। সেই কথাই আমি তুলে ধরছি এখানে ঃ

'On September 9, 1944, Gandhi and Jinnah met at the later's Malabar Hill house for three and quarter hours of private

and secret discussion. Jinnah is known to have kept a record of their talks. Gandhi reported his version to C. R. 'Jinnah says you have accepted his demand and so should I. I said, 'I endorse Rajaji's formula and you can call it Pakistan if you like.'

This, in brief, is Gandhi's Malabar Hill commitment on record, as early as on September 9, 1944, about three years in advance, before the treason of actual partition was effected in 1947 by the guilty men of dismemberment of our Motherland. This is indeed a revelation. The grossest betrayal in the history of the political fate of Bharat.

This perhaps would throw a flood of light as to why Gandhi never resisted partition. Instead, he staked his life for Pakistan, but not for the unity, integrity, dignity and honour of India, that is, AKHAND BHARAT. The nation must pause to reflect, Reassess the role of Gandhi. It is no wonder that the disastrous twenty seven years of Gandhi's leadership, which started after the death of Tilak, with his antinational, imperialist 'Khilafat', ended with the legacy of cowardly, infamous partition of our motherland. Fires are now burning in and all around truncated India.' (Gandhi–Truth behind a veil of mist : Niharendu Dutt-Majumder. P.-3&4)।

অর্থাৎ—১৯৪৪ সালের ৯ সেপ্টেম্বর জিন্নার মালাবার হিলের বাড়িতে গান্ধীজি তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। সেখানে তিন ঘন্টা পনেরো মিনিট দু'জনের মধ্যে ব্যক্তিগত এক গোপন আলোচনা হয়। সেখানেই দেশ-ভাগের সিদ্ধান্ত হয়। এবং পাকিস্তানের কথা ওঠে। গান্ধীজি এ ব্যাপারে সায় দেন। অর্থাৎ, সত্যিকারের দেশ-বিভাগের তিন বছর আগেই তিনি দেশ-বিভাগ মেনে নেন। সবার আগেই গান্ধীজি দেশবাসীর সঙ্গে বেইমানি করেছিলেন। ভারতের ঐক্য, মর্যাদা, অখণ্ডতা সবই শেষ হয়ে যায় গান্ধীজির হাতে।

তাঁর এই কাপুরুষোচিত কাজের জন্যই ভারত ভেঙে জন্ম হয় পাকিস্তানের।

এটা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে এই জন্যই গান্ধীজি ভারত ভাঙার ব্যাপারে কখনও রুখে দাঁড়াননি। দিনের পর দিন শুধু অভিনয়ই করে গেছেন। সত্যের পূজারী ধাপ্পা ও মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন। দোষ চাপিয়েছেন অন্যান্য কংগ্রেস-নেতাদের ঘাড়ে। এর আগেও বলেছি কংগ্রেস-ওয়ার্কিং কমিটির ভারত-বিভাগ প্রস্তাব গান্ধীজি মেনে নিয়েছিলেন। গান্ধী-জিন্নার গোপন বৈঠকের কথাও এখন বললাম। অথচ সবার সামনে কী অভিনয়ই না করলেন গান্ধীজি! সেই কথাই বলছি এখানে ঃ

'Everybody is eager to garland my photo and salute and not to follow me. To-day I find myself all alone. Even the Sardar and Jawharlal think that my reading of the situation is wrong and peace is sure to return if partition is agreed upon...'

অর্থাৎ—'সবাই আমার ফটোতে মালা দিতে উৎসাহী, প্রণাম করে। অথচ কেউ আমাকে অনুসরণ করে না। আমি আজ বড় একা। এমনকী সর্দার প্যাটেল ও জওহরলাল মনে করে পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমার ধারণা ভুল। দেশ-বিভাগ হলেই নাকি সাম্প্রদায়িক শান্তি ফিরে আসবে।

গান্ধীজি সত্যিই একজন দক্ষ অভিনেতা। সব জেনেশুনে কী অপূর্ব অভিনয়টাই না করেছিলেন তিনি সেদিন! ভাবটা এই যে তিনি একাই দেশ-বিভাগের বিরুদ্ধে। বাকিরা পক্ষে। অথচ গান্ধীজিই সবার আগে দেশ ভাগে সায় দেন।

এ বার গান্ধীজির চিঠি-প্রসঙ্গে আরও কিছু বলার আছে। কথায় কথায় মুসলিমদের প্রতি তিনি তাঁর দরদের কথা বলতেন। জিন্নাকে তিনি বলেছেন, 'আমি ইসলাম বা মুসলিমদের শত্রু নই।' এ কথা বলার উদ্দেশ্য কী? আসলে মুসলিমরা তাঁকে বিশ্বাস করতেন না বলেই তিনি তাঁদের বিশ্বাস অর্জনের জন্যই বারবার এই রকম কথা বলেছেন।

নেতাজি কিন্তু কখনও এই ধরনের কথা একবারও উচ্চারণ করেননি। বারবার মুসলিম-মুসলিম বলার জন্যই মুসলিম সমাজ গান্ধীজির উপর বিশ্বাস হারিয়েছিলেন। তিনি রাজনৈতিক বক্তৃতা দেবার সময় রামরাজত্ব

প্রতিষ্ঠা করার কথা বলতেন। মুসলিম সমাজ ভাবত যে রাম তো হিন্দুদের অবতার। সুতরাং, গান্ধীজি হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠার কথাই বলছেন।

তাই কংগ্রেসকেও বৃহত্তর মুসলিম সমাজ হিন্দুদের পার্টি বলে মনে করত। হিন্দু ও মুসলমান আলাদা—এই চিন্তাভাবনা মুসলিম সমাজে প্রকট হয়ে উঠেছিল গান্ধীজির কার্যকলাপের জন্যই। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ক্ষেত্রে গান্ধীজি কেন ব্যর্থ হয়েছিলেন সেটা তো আলোচনা করলাম। এবার এ ব্যাপারে নেতাজি কেন সফল হয়েছিলেন তারই দু-একটা ঘটনা এখানে তুলে ধরছি।

জীবনের চরম মুহূর্তে পরম গোপনীয়তার ক্ষেত্রে নেতাজির সঙ্গে সর্বদা দেখা গেছে মুসলিম ভাইদের। এমনকী নিজের এবং ভারতের মান-সম্মানের দায়িত্বও তিনি তুলে দেন এমন একজনের উপর — যিনি মুসলমান।

প্রথম পর্বের অন্তর্ধানের সময় নেতাজির সঙ্গে দেখা যায় আকবর শা'কে। ভারত-সীমান্ত অতিক্রম করার সময় তিনি সাহায্য করেন নেতাজিকে। তারপর দেখি আবিদ হাসানকে। নেতাজি জার্মানি থেকে জাপানে আসার সময় সেই বিপদসঙ্কুল পথের সঙ্গী ছিলেন আবিদ হাসান। আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চরম সঙ্কট মুহূর্তে সিঙ্গাপুর ত্যাগের সময় নেতাজি আজাদ হিন্দ্ সরকারের সব দায়িত্ব অর্পণ করেন একজন মেজর জেনারেলের উপর। তিনিও মুসলমান। নাম তাঁর এম জেড কিয়ানি।

'ARZI HAKUMAT-E-AZAD HIND, Syonon,

Date 16th August, 1945.

ORDER

During my absence from Syonon, Mazor General M. Z. Kiani will represent the Provisional Government of Azad Hind.

Subhas Chandra Bose

Head of the State

Provisional Government of Azad Hind.'

তোমাকেই আমার প্রতিনিধি হিসেবে রেখে যাচ্ছি কিয়ানি। তুমিই এখন থেকে আজাদ হিন্দ্ সরকারের সর্বেসর্বা। তোমার উপরই ভারতের মান-সম্মানের দায়িত্ব রইল। এ দায়িত্ব পালন করতে তুমি নিশ্চয়ই পারবে।

তারপর তাঁর শেষ রহস্যময় অন্তর্ধানের সেই চিরবিশ্বস্ত সঙ্গী হবিবুর রহমানও মুসলমান।

এবার নেতাজির আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর দিকে তাকানো যাক। সেখানে সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ পদে যাঁরা বহাল ছিলেন, তাঁরা সবাই প্রায় মুসলমান। প্রধান সেনাপতি মেজর জেনারেল এম জেড কিয়ানি, মেজর জেনারেল আজিজ আহমেদ, মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খান, কর্নেল গিলানি, কর্নেল ইশান কাদির, কর্নেল হুসেন প্রমুখ সবাই ছিলেন মুসলমান।

এ ছাড়া বাহাদুর গ্রুপের সর্বোচ্চ অধিনায়ক কর্নেল বুরহানউদ্দিন মুসলমান। আজাদ হিন্দ্ বাহিনী ভারতবর্ষের ইম্ফলে ঢুকলে যিনি পতাকা উত্তোলন করেছিলেন, তিনিও ছিলেন মুসলমান — ইনটেলিজেন্স্ গ্রুপের সর্বোচ্চ অধিনায়ক কর্নেল এস এ মালিক।

মুসলিম সমাজ ছাড়াও সেদিন খ্রিস্টান ও অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরাও ছুটে এসেছিলেন নেতাজির পতাকাতলে। তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এস এ আয়ার, জন এ থিবি এবং কর্নেল স্ট্র্যাচির নাম। এমনকী অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়েদের ভূমিকাও অতুলনীয়। মিস স্টেলা ও জোসেফাইন প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন ভারতের এই মুক্তি সংগ্রামে। বাইরে থেকে নেতাজির পক্ষে যা সম্ভব হয়েছিল, ভারতবর্ষে থেকেও গান্ধীজির পক্ষে তা সম্ভব হয়নি ধর্ম-ধর্ম বলে বাড়াবাড়ি করার জন্য।

কী নেতাজি সুভাষ, কী জওহরলাল নেহরু — কেউই তাঁর এই অদ্ভুত ধর্মের ব্যাপারগুলি পছন্দ করতেন না।

সুভাষ বলতেন, 'স্বরাজের কথা বলতে গিয়ে গান্ধীজি সব সময়ই রামরাজ্যের উপমা দিতেন এবং প্রেম ও অহিংসার কথা বলতে গিয়ে স্মরণ করিয়ে দিতেন বুদ্ধ ও মহাবীরের কথা।'

গান্ধীজির প্রিয়তম শিষ্য জওহরলালও বিরক্ত হয়ে বলেছেন ঃ

'I felt angry with him at his religious and sentimental approach to a political question, and his frequent references to God in connection with it. He even seemed to suggest that God had indicated the very date of the fast. What a terrible example to set. (An Autobiography : P-370)।

অর্থাৎ — আমি তাঁর (গান্ধীজির) উপর ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম। কেননা একটা রাজনৈতিক প্রশ্নকে তিনি ধর্ম ও ভাবাবেগের দিক থেকে বিচার করতেন। আর এ প্রসঙ্গে তিনি সবসময়ই ভগবানের দোহাই দিতেন। এমনকী তিনি কবে অনশন শুরু করবেন তা-ও নাকি ভগবান জানিয়ে দেবেন।

এই ধরনের পাগলামি ধর্মান্ধ ভারতবর্ষেই সম্ভব ছিল, পশ্চিমের কোনও দেশে ভাবাই যেত না। আর এই পাগলামির জন্য গোঁড়া হিন্দুরা তাঁর যত কাছে এসেছিল, মুসলমানরা ঠিক ততদূরেই চলে গিয়েছিল। আগেই বলেছি মুসলমানদের মনে হত রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা মানেই ভারতবর্ষে হিন্দু-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করতে চান গান্ধীজি। তাই মুসলিম সমাজ তাঁর কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল। গান্ধীজি নিজেই বলতেন, 'ধর্ম ছাড়া রাজনীতি অর্থহীন।' সবসময় তিনি রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে জড়িয়ে ফেলতেন। সেদিন কিন্তু এটা কোনও দলের কাছে খারাপ মনে হয়নি। বরং গান্ধীজির এই কার্যকলাপ তাঁকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে তুলে দিয়েছিল।

তা হলে আজ কেন বিজেপি অচ্ছুত? রাজনীতি ও ধর্মকে এক করে কংগ্রেস যদি ঠিক হয়, তবে বিজেপি কেন বেঠিক? তারাও তো গান্ধীজির মতো রামরাজ্যই প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে।

গান্ধীজির উলটো-পালটা কাজের জন্য মুসলিম সমাজ হিন্দুদের চরম শত্রু হয়ে উঠল। সেই কথাই এখানে তুলে ধরছি ঃ

'সিন্ধু প্রান্তের সুলতানকোটে মুসলিম লীগের অধিবেশন হল। তাতে যে গান গাওয়া হল, পাকিস্তান নির্মাণের যারা পক্ষে তাদের মনস্কামনা তাতে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। গানের ভাবার্থ এইরকম—

পাকিস্তানে ইসলামের স্বতন্ত্র কেন্দ্র
যেন নির্মাণ হয়
পাকিস্তানে অমুসলমানদের মুখ দেখার দুর্ভাগ্য যেন আমাদের না হয়।
মুসলিম রাষ্ট্রের ঘর সেদিনই উজ্জ্বল হবে
যেদিন পাকিস্তানে মূর্তিপূজক কন্টকদের অস্তিত্ব নিঃশেষ হবে।
হিন্দুদের অধিকার হল শুধু গোলাম থাকার
এই সব গোলামদের রাজ্যশাসনে অংশগ্রহণে কী অধিকার?

(অনুচ্ছেদ ১২এ/১৯ —গান্ধী হত্যা কেন? গোপাল গোড্‌সে—পৃ.৬২-৬৩)।

আসলে গান্ধীজির অবিমৃশ্যকারিতার জন্যই মুসলিম সমাজ তাঁকে বিশ্বাস করতে পারেনি। উলটে হিন্দুদের উপর তাদের আক্রোশ বেড়ে গেছে দিনের পর দিন।

কিন্তু নেতাজি! তিনি গান্ধীজির মতো ইসলাম বা মুসলিমের শত্রু নন বলে নিজেকে কখনও জাহির করতে যাননি। হাসানভাই, কিয়ানিভাই বা রহমানভাই বলেও কাঁধে হাত রাখেননি। ধর্মকেও টেনে আনেননি দেশের মুক্তি সংগ্রামের জন্য। এই প্রসঙ্গে এখন আবার কিছু বলব।

এমনি একদিনের কথা। সিঙ্গাপুরের বিত্তশালী চেট্টিয়া সম্প্রদায়ের এক কাহিনি। নেতাজির কাছে এসেছেন চেট্টিয়া মন্দির পরিষদের পক্ষ থেকে ব্রিজলাল জয়সওয়াল। বক্তব্য — নেতাজিকে একবার অনুগ্রহ করে তাঁদের মন্দিরে আসতে হবে। এটা তাঁর বিনীত অনুরোধ। চেট্টিয়া মন্দির পরিষদ কিছু দান করতে চায় আজাদ হিন্দ্ ফান্ডে।

— যাব। মাতৃমুক্তির ভাণ্ডার যিনি পূর্ণ করবেন, অবশ্যই তাঁর কাছে যাব। আপনি হয়তো জানেন যে, সুযোগ পেলেই চলে যাই আমি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে। সে সব সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সর্বাধিনায়ক হিসেবে কোনও সম্প্রদায়ের মন্দিরে আমার যাওয়া উচিত নয়।

— আপনি হিন্দু হয়ে এই কথা বলছেন নেতাজি!

— মনে রাখবেন, সুভাষচন্দ্র বোস হিন্দু। নেতাজি ভারতীয়।

— তা হলে সুভাষচন্দ্র বোস হিসেবেই আমাদের মন্দিরে আসুন।

— যাব। অবশ্যই যাব। তবে সুভাষচন্দ্র বোস হিসেবে কোনও দান গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। একমাত্র নেতাজি হিসেবেই দান গ্রহণ করতে পারি।

বিষণ্ণ বদনে ব্রিজলাল জয়সওয়াল বলেন, আমরা কিন্তু মন্দিরে আপনাকে নেতাজি হিসেবেই পেতে চাই। তা কি কিছুতেই সম্ভব নয় নেতাজি?

— কেন সম্ভব নয়? সম্ভব। কিন্তু এক শর্তে।

— বলুন। কী আপনার শর্ত?

— নেতাজি হিসেবে গেলে আমার সর্বধর্মীয় সহকর্মীরাও যাবেন আমার সঙ্গে। হিন্দু-মুসলমান, শিখ-খ্রিস্টান — সবাই আমার ভাই। সবাই ভারতীয়। এঁরা সবাই যদি মন্দিরে প্রবেশাধিকার পান, তবেই আমি যেতে পারি।

আঁতকে ওঠেন ব্রিজলাল জয়সওয়াল। বিস্ময়ে হতবাক তিনি। মনে মনে বলেন এ কী সাংঘাতিক কথা! কী সর্বনাশ! দুশো বছরের পুরনো পবিত্র মন্দির! আর সেই মন্দিরে প্রবেশ করবে কিনা বিধর্মীরা! না, অসম্ভব। একেবারে অসম্ভব। এ যে ভাবাও যায় না।

— ঠিক আছে। ভেবেচিন্তে পরে জানাবেন। বলেন নেতাজি।

নিঃশব্দে মাথা নিচু করে ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে গেলেন ব্রিজলাল জয়সওয়াল।

এই হলেন নেতাজি। এই তাঁর আসল পরিচয়। এখানেই গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর তফাত।

কী আশ্চর্য! পরের দিনই আবার ব্রিজলাল জয়সওয়াল এসে হাজির। সঙ্গে মন্দির-কমিটির কয়েকজন কর্মকর্তা।

—আপনার প্রস্তাবই আমরা মেনে নিলাম নেতাজি। বললেন ব্রিজলাল জয়সওয়াল, আপনি আপনার সর্বধর্মীয় সহকর্মীদের নিয়ে আমাদের মন্দিরে আসুন। কোনও আপত্তি নেই আমাদের। সবাই আমরা মায়ের সেবক।

সে এক দৃশ্য! মন্দিরের প্রবেশ-দ্বারে উপস্থিত নেতাজি। উপস্থিত তাঁর সর্বক্ষণের সহকর্মীরা। মন্দিরে প্রবেশ করবেন নেতাজি প্রায় একশো সর্বধর্মীয় সহকর্মীদের নিয়ে। উন্মুক্ত করা হল মন্দির-দ্বার। উৎসবের সাজে সেজেছে মেয়েরা। হাতে খই আর ফুল। উলুধ্বনি দিয়ে অভ্যর্থনা জানাল তারা নেতাজি আর তাঁর সঙ্গীদের। মন্দিরের পথের উপর আঁকা হয়েছে আলপনা। ওই পথ ধরেই আগে আগে ফুল ছড়াতে ছড়াতে চলেছে মেয়েরা।

সেই পথেই নেতাজিও ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছেন সঙ্গীদের নিয়ে। হঠাৎ এগিয়ে এল সদ্য ফোটা কুসুমের মতো এক অপরূপা। সারা দেহে তার যৌবনের জোয়ার। পরনে বেনারসি। সর্বাঙ্গে হিরে-পান্না, মণি-মুক্তোর গহনা। এই অপরূপা ব্রিজলাল জয়সওয়াল-তনয়া। হাতে তার মাঙ্গলিকি থালা। ললাটে চন্দন-তিলক এঁকে বরণ করে নিল সে সবাইকে।

উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ পেরিয়ে প্রবেশ করলেন মন্দির-অভ্যন্তরে নেতাজি আর তাঁর সর্বধর্মীয় সহকর্মীরা। ব্রাহ্মণ ছাড়া যেখানে কারও প্রবেশাধিকার নেই, প্রবেশ করলেন সেখানেও নেতাজির সব সহকর্মী। মন্দিরের গর্ভগৃহে দেবতাদের মূর্তি যেখানে প্রতিষ্ঠিত তার সামনে খালি পায়ে এসে দাঁড়ালেন সবাই। হিন্দু-মুসলিম, শিখ-খ্রিস্টান—সবার ভালে হোমশিখার জয়তিলক এঁকে দিলেন প্রধান পুরোহিত। সবাই নমস্কার করলেন মন্দিরে।

মন্দির-চত্বরে বিপুল জনসমাবেশ। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে সবাই নেতাজির ভাষণ শোনার জন্য।

শুরু করলেন নেতাজি ঃ

'আমরা সবাই ভারতমাতার সন্তান। ধর্ম আমাদের আলাদা হতে পারে — বর্ণও আলাদা হতে পারে, কিন্তু তাতে কী যায় আসে! সন্তান তো আমরা একই মায়ের। সবাই আমরা এক ও অভিন্ন। ভাই-ভাই। আমাদের সেই মা আজ বন্দিনী। মাতৃ-শৃঙ্খল মোচনের জন্য হাতে হাত মিলিয়ে এগিয়ে এসো ভাইসব। দ্বিধাহীন চিত্তে মুক্ত কণ্ঠে বলো — আমরা খুলব মা তোর শৃঙ্খল—আমরা তো মা তোরই সন্তান। ধর্ম—সে তো ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমাদের মাতৃমুক্তি মন্ত্রে ধর্ম কেন অন্তরায় হবে? দেশ মাতৃকার মুক্তির এই পবিত্র সংগ্রামে আমাদের একমাত্র পুকার হবে 'জয়হিন্দ'।'

সত্যি বিস্ময়! ভাবাও বুঝি যায় না। একটি প্রাচীন হিন্দুমন্দিরে সর্বধর্মীয় মানুষের এই মহামিলন বুঝি স্বপ্নেরও অগোচর। তাই কৃতজ্ঞ মুসলমানরা তাঁকে 'নেতাজি' বলে হৃদয়ে তুলে নিয়েছিলেন।

এই হলেন সর্বধর্ম সমন্বয়ের জন্মসাধক নেতাজি সুভাষ। তিনি গান্ধীজির মতো কথায় কথায় রাজনীতি বা স্বাধীনতা সংগ্রামে ইসলামকে টানতেন না। তাঁর স্পষ্ট কথা — ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার। যে যার মতো করে পালন করবে, তাতে তো কোনও অসুবিধে নেই।

চতুর গান্ধীজিও নেতাজির সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অসাধারণ ক্ষমতা দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিলেন ঃ

'The greatest lesson that we can draw from Netaji's life is the way in which he infused the spirit of unity amongst his men so that they could rise above all religious and

provincial barriers and shed together, their blood for the common cause. His unique achievement would surely immortalize him in the pages of history.'

গান্ধীজির বিশেষ গুণ ছিল সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা। আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর কীর্তিগাথার পর নেতাজি সম্বন্ধে এ কথা বলা মানে তাঁর জনপ্রিয়তা প্রচণ্ড বেড়ে যাওয়া। তাই তখন তিনি সবসময় নেতাজির প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন।

আগেই বলেছি গান্ধীজি ছিলেন পুরোপুরি অসংলগ্ন। নিজের ভুলের জন্যই বড় ছেলে হিরালাল বিপথগামী হয়েছিলেন। অন্য ছেলেরাও তাঁকে সুনজরে দেখতেন না। স্ত্রী কস্তুর বাঈ প্রচণ্ড বিরক্ত হতেন মাঝে মাঝে তাঁর দুর্ব্যবহারে। গান্ধীজির সংসার-জীবন সুখের ছিল না।

গান্ধীজি ছিলেন কামুক। তিনি এত বেশি কামুক ছিলেন যে মৃত্যুপথযাত্রী পিতাকে ফেলে গর্ভবতী স্ত্রীর সঙ্গে যৌনসুখে লিপ্ত হন। যখন তিনি চরম সুখ সম্ভোগে মত্ত, তখনই এল পাশের ঘর থেকে পিতার মৃত্যুসংবাদ। এই কামুক গান্ধীই আবার বলেছেন অন্য কথা। বেশ্যালয়ে গিয়ে বেশ্যাকে স্পর্শ করেননি। ফলে বেশ্যা তাঁকে ঘর থেকে বের করে দেয়। এটা কি আদৌ সত্য?

মোটেই না। কারণ, তিনি একাধিকবার বেশ্যালয়ে গিয়েছেন। যৌন ব্যাপার না থাকলে কোনও লোক কি বারবার বেশ্যাবাড়ি যায়? এখানেও মনে হয় সত্যের পূজারী মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন। যে মানুষের ৪৬ বছর বয়সে সুন্দরী মহিলাদের দেখে বীর্যস্খলন হয়, সেই মানুষ ভরা যৌবনে বারবার বেশ্যালয়ে গিয়ে বেশ্যাকে কোনওরকম স্পর্শ না করে ফিরে এসেছেন—এটা কি আদৌ সম্ভব?

না। এ অসম্ভব। অবাস্তব। অবিশ্বাস্য।

এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করছি ঃ 'গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ১৯১৫ সালে ভারতে ফিরে আসেন। সুসজ্জিতা গুজরাতি সুন্দরী মহিলারা তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়েছিলেন। তাদের দেখে গান্ধীর যৌন উত্তেজনা এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে তাঁর বীর্যস্খলন হয়েছিল।' (আত্মনিরীক্ষণ, ৬ মে ২০০৭)।

এ হেন কামুক মিথ্যাবাদী ছদ্মবেশী মানুষ দেবতার আসনে বসে ছিলেন দিনের পর দিন। গান্ধীজির এই ছদ্মবেশ তখন বেশিরভাগ ভারতবাসী বুঝতে পারেনি। সেটাও সম্ভব হয়েছিল কংগ্রেসি প্রচারের জন্য।

কেন এই মিথ্যা প্রচার?

কারণ — গান্ধী-ভীতি।

গান্ধী-ভীতিই বা কেন?

কংগ্রেসের প্রথম শ্রেণির অনেক নেতাই জানতেন যে গান্ধীজি ব্রিটিশের সুনজরে। তাই তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করা খুবই কঠিন। সব জেনেশুনেও তাঁরা মুখে কুলুপ এঁটে থাকতেন। কেননা, তাঁদের মধ্যে ছিল লোভ। গদির লোভ। আর এই লোভের জন্য তাঁরা গান্ধীজিকে সমীহ করে চলতেন। দুর্দান্ত পরাক্রমশালী ব্রিটিশ যার হাতে সে তো বেপরোয়া হবেই। গান্ধীজিও তাই বেপরোয়াই হয়েছিলেন। তিনি যা খুশি তাই করতেন। কোনোকিছু মানতেন না। আশ্রমের মধ্যে নানারকম নোংরা কাজ করেছেন দিনের পর দিন। তাঁর ভোগাসক্তি এতটাই তীব্র ছিল যে, তাঁর সান্নিধ্যে যে সব মহিলা এসেছেন তাঁদের অনেককেই তিনি শারীরিক সম্পর্কে আবদ্ধ করেছেন।

'যৌনজীবনে গান্ধীজির সীমাহীন দ্বিচারিতা, যাকে তিনি সগৌরবে ব্রহ্মচর্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষা (Experiment with Brohmacharya) আখ্যায় ভূষিত করেছেন।

(ক) গান্ধীজী যখন হাঁটতেন তখন মেয়েদের কাঁধে হাত রেখে তাদেরকে লাঠি হিসেবে ব্যবহার করতেন। এর নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলতেন ঃ মেয়েরা তাঁর লাঠি হিসেবে ব্যবহৃত হতে চেয়েছে বলেই তিনি তাদের কাঁধে হাত দিয়ে চলতেন। এ ব্যাপারে তাঁর নাতনি মনু বলেছেন, 'মেয়েরা যখন তাঁর লাঠি হিসেবে ব্যবহৃত হতে চাইতো না, তখন তিনি তাদেরকে জোর করে লাঠি হিসেবে ব্যবহার করতেন।

(খ) অধ্যাপক নির্মল বসুর এক প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী লিখছেন, যেহেতু মেয়েরা তাঁর সাথে একত্রে রাত্রিযাপন করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে, তাই তিনি তাদেরকে তার সাথে রাত্রিযাপন করার অনুমতি (Permitted) দিয়েছেন।

(গ) ঠক্কর বাপার সাথে একদিন (২৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭) যখন

গান্ধীজীর ব্রহ্মচর্য নিয়ে গরম আলোচনা হচ্ছিল, তখন তিনি রেগে বলেছেন, "যৌন পরীক্ষা নিয়ে আমি আমার অভ্যাস ত্যাগ করতে পারবো না। তোমরা যদি মনে কর আমি কপটাচরণ (Imposter) করছি, আমাকে অপবাদ দাও। সেক্ষেত্রে দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ আমার মহাত্মা-অভিদা থেকে মোহমুক্ত হবেন। আমিও আমার বিভ্রান্তি থেকে মুক্তি পাবো।"

(ঘ) নিজেকে সত্যনিষ্ঠ বলে প্রমাণ করার জন্যে একবার গান্ধীজী বলেছেন, "এই যে আশ্রম দেখছ, এখানে আধপাগলা, মস্তিষ্কবিকৃত এবং উন্মাদ লোকেরাই থাকে। আর আমি হচ্ছি এদের মধ্যে সেরা পাগল।"...

(ঙ) ...কীর সাহেব আরও লিখেছেন, "Gandhi was overconcious of his sex. He had tried for years to suppress it. But he could not succeed in banishing it from his thoughts.....

গান্ধীজী যখন তাঁর তথাকথিত ব্রহ্মচর্য নিয়ে কাজ করছিলেন তখন তাঁর বয়স ৭৭ বৎসর। ঐ বয়সে শৃঙ্গার-সুখের চেয়ে স্পর্শ-সুখই বেশী কামনার বস্তু। কারণ, শৃঙ্গার-সুখের অবস্থা তখন আর থাকে না।

(চ) গান্ধীজীর যৌন পরীক্ষা প্রসঙ্গে অধ্যাপক নির্মল বসুর (যিনি গান্ধীজীর নোয়াখালীর রাজকীয় সফরের ব্যক্তিগত সেক্রেটারী ছিলেন) অভিজ্ঞতাও সুখকর নয়। তিনি তাঁর 'Last Days with Gandhi' শীর্ষক পুস্তকের এক জায়গায় লিখছেন, দিনের পর দিন নিজে উলঙ্গ অবস্থায় থেকে, উলঙ্গ নারীদের নিয়ে রাত্রিযাপন করার ফলে গান্ধীজী তাদের মানসিক রোগের কারণ হয়েছেন। এই অভিযোগের উত্তরে গান্ধীজী বলেছেন, তাঁর সাথে ওভাবে রাত্রিযাপনের ফলে তাদের মানসিক রোগ হয়নি, পূর্ব থেকেই তাঁরা মানসিক রোগাক্রান্তা ছিলেন।

'Prof. Nirmal Kumar Bose complained to Gandhi that most of the women who took part in the sex-experiment of Gandhi suffered from hysteria (মূর্ছা বা মৃগি রোগ). In reply Gandhi wrote that those women suffered from hysteria even before he used them in his sex-experiment.' (Kothari, P.65-66) অর্থাৎ, যৌনপরীক্ষার (Sex-experiment) ফলে যে সব মেয়েরা মূর্ছা রোগাক্রান্ত হচ্ছেন বলে অধ্যাপক বসু অভিযোগ করেছেন তা ঠিক নয়। গান্ধীজীর

সঙ্গে যৌন-পরীক্ষায় (Sex-experiment) লিপ্ত হবার পূর্ব থেকেই সেই সব মেয়েরা মূর্ছা বা মৃগি রোগগ্রস্ত ছিলেন।

(ঝ) এভাবে মেয়েদের শয্যা-সঙ্গিনী করে নিজের বিকৃত যৌনলিপ্সা চরিতার্থ করেছেন তিনি। তা করতে যেয়ে মেয়েদেরও যে যৌনকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করেছেন (যা নিবৃত্তি করার ক্ষমতা তখন তাঁর ছিল না) তা যখন তারা পাননি, তখন তাঁদের পক্ষে মানসিক রোগগ্রস্ত হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল এবং তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল তাদের মূর্ছা যাওয়ার ভেতর দিয়ে। সেদিন গান্ধীজি তাঁর বিরাট খ্যাতির জোরে অধ্যাপক বসুর অভিযোগ অতি সহজেই এড়িয়ে যেতে পেরেছিলেন, কিন্তু কোনক্রমেই সত্যের পূজারী সত্য-ধর্মের মান-মর্যাদা রক্ষা করেননি।.....

(ণ) গান্ধীজীর এই ব্রহ্মচর্য বা Sex-experiment-এ তিতিবিরক্ত হয়ে তাঁরই ব্যক্তিগত Stenographer 'Parasuram who was most devoted and selfless deserted Gandhi as Gandhi's experiment in sex were untolerable to him. Gandhi lay naked in the bed with his Grand daughter Manu. This kind of relationship also had with his several other female associates.'

(যে মহাত্মা সারাজীবন দ্বিচারিতা করে গেছেন ঃ প্রিয়রঞ্জন কুণ্ডু—পৃ. ৬২-৬৬)

নিজের নাতনি মনুর সঙ্গে বিছানায় উলঙ্গ হয়ে শুয়ে থাকতেন গান্ধীজি। এরকম আরও অনেক মেয়ের সঙ্গেই তিনি এই ধরনের সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। এই সব দেখে গান্ধীজির স্টেনোগ্রাফার বিরক্ত হয়ে তাঁকে ছেড়ে চলে যান। গান্ধীভক্ত স্টেনোগ্রাফার পরশুরাম গান্ধীজিকে আর সহ্য করতে পারেননি। অনেকেই গান্ধীজির এই সব নোংরা ব্যাপার মেনে নিতে পারেনি। পারার কথাও নয়। আমি এই বিকৃত যৌনাচারের আরও কিছু ঘটনার উল্লেখ করছি। ১৯৪৬ সালে নোয়াখালিতে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরে গান্ধীজি যখন সেখানে যান, তখন অনেকেই তাঁর সফর-সঙ্গী হয়েছিলেন। এই যাত্রা গান্ধীজির জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। নোয়াখালির সেই ঘটনা খুব সুখের ছিল না। নির্মলকুমার বসুর 'সাতচল্লিশের ডায়েরি'র সমালোচনার কিছু অংশ এ প্রসঙ্গে তুলে ধরছি।

সমালোচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল ২০০৯-এর ২১ ফেব্রুয়ারি আনন্দবাজার পত্রিকায় ঃ

'সাতচল্লিশের ডায়েরি আরম্ভই হয়েছে একটা বিস্ফোরক পরিস্থিতির আলোচনা দিয়ে। এ বিষয়ে নির্মলকুমার বসু পরে সুখরঞ্জন সেনগুপ্তকে যা বলেছিলেন, তা এরকম ঃ ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৪৬ তারিখে গাঁধী যখন নোয়াখালির শ্রীরামপুরে নিজের আশ্রম থেকে আধ মাইল দূর হাঁটছিলেন, তখন হঠাৎ বৃষ্টি নামে। আশ্রমে ফিরে আসতে তিনি সম্পূর্ণ ভিজে যান এবং ঠাণ্ডায় ঠকঠক করে কাঁপতে থাকেন। ডা. সুশীলা নায়ার একা-একাই তাঁকে মুছিয়ে, শুকনো কাপড় পরিয়ে কয়েকখানি কম্বল চাপা দেন। তাতেও তাঁর কাঁপুনি থামছে না দেখে গাঁধীর শরীরে নিজর দেহের উত্তাপ সঞ্চার করতে সুশীলা তাঁকে জড়িয়ে ধরে ঝাঁকাতে থাকেন। ঘরের দরজা সব সময় খোলাই থাকত। গাঁধীর স্টেনোগ্রাফার তামিল ব্রাহ্মণ পরশুরাম তাঁকে কিছু বলার জন্য ঘরে ঢোকেন এবং এ-দৃশ্য দেখে আহত হন। গাঁধী নিজেও নাকি বিব্রত হয়ে কপালে করাঘাত করছিলেন, পরশুরাম তা দেখে ভাবেন সুশীলাকে গাঁধী আঘাত করছেন। তিনি পরে গাঁধীর কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে, সুশীলাকে তিনি সে দিন মেরেছিলেন কিনা। গাঁধী জবাবে বলেন, পঁচিশ বছর বয়সে ছেলেকে তিনি আঘাত করেছিলেন, তারপর আর কাউকে করেননি। প্রকৃতপক্ষে সে দিন তিনি নিজেকেই চপেটাঘাত করেছিলেন। পরশুরাম ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেননি এবং গাঁধীকে ছেড়ে তিনি চলে যান।

বিষয়টি নিয়ে নির্মলকুমার বসুর সঙ্গেও গাঁধীর আলাপ হয়। গাঁধীর মহত্ত্বে অটল বিশ্বাসী নির্মলকুমার এই ঘটনা ক্ষমার যোগ্য জ্ঞান করেন। কিন্তু গাঁধী যে নিজের বিছানায় মেয়েদের আশ্রয় দিতেন, সে সম্পর্কে তাঁর অস্বস্তি ছিল। গাঁধী বলেন, মেয়েদের সঙ্গে শয়ন করলেও তাদের মনে বিন্দুমাত্র কামভাব জাগে কি না, তা তিনি পরীক্ষা করছেন। নির্মল বসু বলেন, 'এ রকম পরিস্থিতি সংশ্লিষ্ট মেয়েদের নিউরোটিক করে তুলতে পারে। এটার জন্য আপনি দায়ী, এটা আমার ভালো লাগেনি।'.....

মার্চ মাসের মাঝামাঝি আর দু'জন গাঁধীবাদী, স্বামী আনন্দ ও নাথজি নোয়াখালিতে উপস্থিত হন মেয়েদের নিয়ে গাঁধীজির শয়নের বিষয়

আলোচনা করতে। নাথজির শিষ্য কিশোরলাল ঘনশ্যামদাস মশরুওয়ালা এ-সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা পেতে আগ্রহী হন। নির্মলকুমার প্রথমোক্ত দু'জনের সঙ্গে মৌখিক আলোচনা করেন এবং কিশোরলালের সঙ্গে পত্র-বিনিময় করেন। তাঁরা তিন জনেই যে গাঁধীর আচরণ অনুমোদন করেন না, তা-ও কিশোরলাল স্পষ্ট করে জানান। মনু গাঁধীকে নিয়ে গাঁধীর শোওয়ার ব্যাপার নির্মল বসুর কাছেও এক পর্যায়ে 'নোংরা' লেগেছে।

গাঁধী-চরিত্রের অন্য দিকের সমালোচনাও তিনি করেছেন। অযোগ্য লোককে কেন গাঁধী প্রশ্রয় দেন, এ প্রশ্নের উত্তর তিনি পাননি। ব্যক্তিগত সম্বন্ধ গাঁধীর বিচারভ্রংশের কারণ হয় বলে তিনি লক্ষ করেন, মানুষের হৃদয় বা ভালবাসার ব্যাপারেও তাঁর বিচার ভুল হতে দেখেন, তাঁর মধ্যে পক্ষপাত দেখতে পান।'

গান্ধীজির মধ্যে পক্ষপাত অবশ্যই ছিল। নেতাজি সুভাষ এবং জওহরলালের দিকে তাকালেই সেটা দিবালোকের মতো স্পষ্ট। ক্ষমতালোভী জওহরলাল তাঁর মানসপুত্র। তিনি নেহরু ও তাঁর পরিবারের জন্য অনেক কিছুই করেছেন। কিন্তু ভারতের শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক নেতাজিকে সহ্য করতে পারতেন না। কারণ, সুভাষ তাঁর পোষ মানেননি। কোনোকিছুর বিনিময়ে তিনি নিজের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি। এমনকী প্রধানমন্ত্রীর গদির জন্যও নয়। তাই গান্ধীজি সুভাষকে সরিয়ে দিয়েছিলেন কংগ্রেস থেকে। গান্ধীজি চিরদিনই পক্ষপাতিত্ব ও দ্বিচারিতা করে এসেছেন। ফিরে আসি আবার গান্ধীর যৌনজীবনে।

এম এম কোঠারি লিখেছেন ঃ 'Raj Kumari Amrit Kaur and Miss Slade would Kiss his (Gandhi's) hand', 'he would stroke their cheeks.' He wanted to show that his mastery over 'last' was not achieved by avoiding woman.' (Critique of Gandhi : P.—67).

অর্থাৎ, রাজকুমারী এবং মিস্ স্লেড গান্ধীর হাতে চুমু খেতেন। তিনি তাঁদের গালে হাত বুলিয়ে দিতেন। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন নারীদের বাদ দিয়ে তিনি তাঁর লালসা জয় করতে পারেননি।

রাজকুমারী অমৃত কাউরকে তিনি এক চিঠিতে লিখেছেন ঃ 'My

meaning of Brahmacharya is this — one can never has any lustful intention...has become capable of lying naked with naked women.' (Ibid : P-69).

অর্থাৎ, আমার ব্রহ্মচর্যের অর্থ হল—একজন ব্যক্তির কোনও কামনা পূর্ণ ইচ্ছা থাকবে না...তিনি নগ্ন হয়ে নগ্ন মহিলাদের সঙ্গে শুয়ে থাকতে সক্ষম।

গান্ধীজি প্রচণ্ড কামুক ছিলেন। সেটা আগেই প্রমাণসহ দেখিয়েছি। একজন কামুক লোকের পক্ষে এই অবস্থায় নিজেকে সংযত রাখা অসম্ভব। বাস্তববোধ তাই বলে। গান্ধীর ভোগাসক্তি এতটাই তীব্র ছিল যে, তাঁর সান্নিধ্যে যে সব মহিলারা এসেছেন তাঁদের অনেককেই তিনি শারীরিক সম্পর্কে আবদ্ধ করেছেন। সুধীর কাকার 'Mira and the Mahatma' গ্রন্থে গান্ধীর সঙ্গে মীরার গভীর প্রেমের বর্ণনা আছে। মীরা বেনের আসল নাম Madeleen Slade. তাঁর পিতা ছিলেন একজন ব্রিটিশ অ্যাডমিরাল। মীরা গান্ধী সম্পর্কে প্রচারে আকৃষ্ট হয়ে সবরমতী আশ্রমে এসেছিলেন। পরে বিরক্ত হয়ে আশ্রম ত্যাগ করেন।

গান্ধীজির পরকীয়া প্রেম শুরু হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকায় আশ্রম প্রতিষ্ঠার সময় থেকে। তিনি ব্রহ্মচর্য পরীক্ষার কথা বলেছেন লোক জানাজানি হবার পর। যুবতী মেয়েদের নগ্ন অবস্থায় শয্যাসঙ্গিনী করে নিজে নগ্ন হয়ে রাত্রি যাপন করতেন তিনি। এটা স্রেফ বিকৃত যৌনাচার ছাড়া অন্য কিছুই নয়। গান্ধীজি তাঁর ব্যক্তিত্ব, বিরাট নাম এবং মর্যাদার সুযোগ নিয়েছেন। তাঁর এই ধরনের কাজ নিঃসন্দেহে বিরাট অপরাধ। সেই দিক থেকে তিনি একজন ক্ষমার অযোগ্য অপরাধী। মেয়েরা গিনিপিগ নয় যে তাদের নিয়ে তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবেন। তাদের যেন তিনি খেলার পুতুল ভাবতেন। যা ইচ্ছে তাই করা যায়। গান্ধীজির শয্যাসঙ্গিনীরা মানসিকি রুগীতে পরিণত হয়েছিল। তারা প্রায়ই মূর্ছা যেত। বৃদ্ধ বয়সে মানুষের যৌন ক্ষমতা থাকে না। তাই যুবতী মেয়েরা সেই সময় গান্ধীজির কাছ থেকে তেমন কিছু পেত না যা তাদের তৃপ্ত করতে পারে। আর সেই জন্যই তারা মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়েছিল। নিজের নাতনি মনু গান্ধী গান্ধীজিকে অভিযুক্ত করে বলেছেন—'তুমি আমাকে শেষ করে দিয়েছ।' সমাজের

চোখে গান্ধীজি অমার্জনীয় অপরাধ করেছেন। একই কথা সুশীলা নায়ারও বলেছেন—আসলে গান্ধীজি একজন মানসিক রুগী। তাই তাঁর এই ধরনের বিকৃত যৌনাচার।

ব্রহ্মচর্য পালন করার শপথ গ্রহণ করেন গান্ধীজি ১৯০৬ সালে। কস্তুর বাঈয়ের সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন করে পরকীয়া প্রেমে মগ্ন হন তিনি। এটা স্ত্রীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা। চার পুত্রের পিতার ব্রহ্মচর্যের প্রয়োজন কী? আর বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য পালন মানে পাগলামি। স্ত্রীকে বঞ্চিত করা। ব্রহ্মচর্য পালন করতে হলে কি সুন্দরী যুবতী মেয়েদের নগ্ন করে নিজে নগ্ন হয়ে রাত্রি যাপন করা? এ প্রসঙ্গে ধনঞ্জয় কীরের লেখার উল্লেখ করছি ঃ

'Gandhi was over conscious of his sex. He had tried for years to suppress it. But he could not succeed in banishing it from his thoughts. It may be said that no great Indian saint ever made such experiment with woman, married or unmarried. A saint who does so would not stand high in the domain of culture and religion.' (Mahatma Gandhi Political Saint and Unarmed Prophet. P–756).

—অর্থাৎ, গান্ধী তাঁর যৌন ব্যাপারে প্রচণ্ড সচেতন ছিলেন। তিনি বহু বছর যাবৎ এটা দমন করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কিছুতেই সফল হননি। এটা ঠিক ভারতের কোনও বিখ্যাত সাধু বিবাহিত বা অবিবাহিত মেয়েদের নিয়ে এই রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেননি। একজন সাধু যিনি এই ধরনের আচরণ করেন তিনি সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে বড় একটা সফলতা লাভ করতে পারেন না।

গান্ধীজির মধ্যে প্রবল যৌনচিন্তা ছিল। আমরা আগেই এটা দেখেছি। পিতার মৃত্যুর সময় গর্ভবতী স্ত্রীর সঙ্গে যৌনসুখে লিপ্ত হওয়া এবং একাধিকবার পতিতালয়ে যাওয়া—এটা প্রচণ্ড কামুক না হলে কেউ করে না। গান্ধীজি কামুক হয়ে হঠাৎ ব্রহ্মচর্য পালনের সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন কেন? কারণ, যুবতী মেয়েদের সঙ্গে যৌন-সম্পর্ক গড়ে তোলা। নিজের স্ত্রীকে দূরে সরিয়ে রেখে এই অসৎ কাজ করার জন্যই তিনি ব্রহ্মচর্য পরীক্ষার গল্প ফেঁদেছিলেন।

১৯৪৭ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি ঠক্কর বাপার সঙ্গে গান্ধীজির ব্রহ্মচর্য নিয়ে দুজনের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ হয়। গান্ধীজি রেগে গিয়ে বলেন, 'যৌন পরীক্ষা নিয়ে আমি আমার অভ্যাস ত্যাগ করতে পারব না। তোমরা যদি মনে করো আমি কপটাচরণ করছি, আমার বিরুদ্ধে অপবাদ দাও। সে ক্ষেত্রে দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ আমার মহাত্মা অভিধা থেকে মোহমুক্ত হবে। আমিও আমার বিভ্রান্তি থেকে মুক্তি পাব।' (যে মহাত্মা সারা জীবন দ্বিচারিতা করেছেন ঃ প্রিয়রঞ্জন কুন্ডু — পৃ. ৬৩)।

গান্ধীজির এই ব্যাপারটা অনেকটা রজনীশের মতো বলা চলে। রজনীশের আশ্রম প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল যৌন ব্যাপার। শরীরী সম্পর্কই ঘটত সেখানে নিয়মিত। গান্ধী পরবর্তী যে সব আশ্রমের জন্ম হয়েছে সেখানে যৌন ব্যাপারটা ঢুকেছিল গান্ধী-আশ্রমের এই সবের জন্য। অনেক তথাকথিত সাধুবাবা গান্ধীজির ওই নোংরামোই অনুকরণ করেছিল। সুতরাং, গান্ধীজির আশ্রমের জন্য দেশে মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গলই হয়েছে বেশি। গান্ধীজি সারা জীবনই নিজের স্বার্থ দেখেছেন আগে। অপরের কথার মূল্য তাঁর কাছে বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। অহিংসার অদ্ভুত এক নামাবলি গায়ে জড়িয়ে যা খুশি তাই করতেন।

এ প্রসঙ্গে দিগ্বিজয় দে সরকারের 'গান্ধীজীর আধ্যাত্মিক স্ত্রী ও সহযোগী মেয়েরা' গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি ঃ

'সুশীলা নায়ার—'গান্ধী স্পেশাল'

কত জনের কত কথা আর সহ্য হয়! না, গান্ধীজী ঠিক করলেন তিনি আর কোনো মহিলার সেবা গ্রহণ করবেন না। লোকে না বুঝে তাঁকে অপবাদ দিচ্ছে। এই ঘোষণায় যে দু'জন নারী বিমর্ষ হলেন তাঁরা হলেন সুশীলা ও প্রভাবতী। সুশীলা সমস্ত দিন কাঁদতে থাকলেন আর প্রভাবতী বারবার মূর্ছা যেতে থাকলেন। তাঁর ঘোষণার বার ঘন্টাও গেল না। সুশীলার সেবা তাঁকে গ্রহণ করতে হল। কারণ, সুশীলা তাঁর কাছে অপরিহার্য, সে বিশেষ—'স্পেশাল'। সুশীলা, গান্ধীজীর ভাষায়, সহজেই তাঁকে বুঝে নিয়েছে, সকলের চেয়ে পরে এলেও। সে তাঁর ব্রহ্মচর্যের সাধনার তিনটি পর্বেই উত্তীর্ণ হয়েছে। ১৯৩০ সাল থেকে নোয়াখালি যাত্রা পর্যন্ত সুশীলা গান্ধীজীর সাথী হয়ে দৈহিক স্পর্শ থেকে শুরু করে

'প্রয়োগ' ও 'মহাযজ্ঞে' অংশ নিয়েছেন। সুশীলা সবচেয়ে বেশি সময় গান্ধীজীর সান্নিধ্য লাভ করেছেন।...

একটা সময় তিনি একলা থাকতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন সুশীলার উপর নির্ভরতাহীনভাবে থেকে শান্তি পেতে। কিন্তু কী পেলেন তিনি? রাতে ঘুমই হল না তাঁর। — তুমি ছিলে না, গত রাতে আমি দু'টায় উঠেছি। আবার যখন সুশীলার চিঠি পেলেন তখন শান্ত হলেন— তোমার চিঠি পেলাম, রাতে ঘুম হয়েছে। এর সরলার্থ—সুশীলা থাকলে তিনি ভাল থাকেন। সুশীলা ভাল থাকলে তিনিও ভাল থাকেন। এ তাঁর বৃথাই বলা, 'For God's shake leave me alone to rest in peace. I had enough of you.' সুশীলা তখন মনে মনে নিশ্চয়ই হেসেছেন।...সুশীলা ছাড়া গান্ধীজীর দিন যায় না, রাত নিদ্রাহীন।

সুশীলার দাদা প্যারীলাল এই সুযোগ ব্যবহার করতে সচেষ্ট। সে গান্ধীজীর সচিব কিন্তু সখা নয় মোটেই। গান্ধীজী কেন জানি সদাই তাকে ভয় করেন। আশ্রমিকগণ গান্ধীর অন্য সব সহচর সহচোরীগণ সব দেখেন, সব বোঝেন। তাঁরা এই ভাই-বোনের আধিপত্য মানতে চান না। আশ্রম জুড়ে বিষাক্ত পরিবেশ তৈরি হয়। শহরে গল্প-গাছা চলে। এ সবের মূলে গান্ধীজী।'

সুশীলার দাদাকে গান্ধীজি কেন ভয় পেতেন? কারণ, সুশীলার সঙ্গে গান্ধীজি যা খুশি তাই করতেন। একটি যুবতী মেয়েকে তিনি হাতের পুতুল বানিয়েছেন। সুতরাং, তাঁর দাদাকে ভয় পাওয়াটাই স্বাভাবিক। অপরাধীকে ভয় পেতেই হয়। না হলে গান্ধীজির মতো ক্ষমতাশালী বিরাট ব্যক্তি কেন তাকে ভয় পাবেন?

'...এরই মধ্যে প্যারীলাল যোগা খাড়ে নামে একটি মেয়ের সাথে প্রণয়-কথন শুরু করে। গান্ধীজি ঝাঁঝালো কণ্ঠে তাকে শাসন করতে চাইলেন— তুমি আমার শিক্ষার অযোগ্য। কার সাথে কী করছো তুমি? প্রায় দুটি বছর অশান্তি করল প্যারীলাল। গান্ধীজীকে অগ্রাহ্য করত সে। আর গান্ধী তাকেই ভয় পেতেন।'...

যে গান্ধীজি কথায় কথায় সবাইকে ভয় দেখান সেই মহাত্মা গান্ধী প্যারীলালের মতো একজন সাধারণ মানুষকে ভয় পেতেন। গান্ধীজি ভয়

দেখাতেন কংগ্রেসের তাবড় তাবড় নেতাদের। ভয় দেখাতেন গোটা কংগ্রেস দলকে। ভয় দেখাতেন অনেক বিশিষ্ট মানুষকে। সেই গান্ধী কেন ভয় পেতেন প্যারীলালকে? এটা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে প্যারীলাল গান্ধীজির সচিব ছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই গান্ধীজির অনেক কিছুই জানতে পেরেছিলেন। তা ছাড়াও সুশীলা তার বোন। সেই সুশীলাকে দিয়ে কী না করাতেন গান্ধীজি?

'সুশীলা গান্ধীজীকে স্নান করাতেন, মালিশ করতেন—এটা ছিল প্রাত্যহিক স্বাস্থ্য-কৃত্য। কিন্তু এ নিয়ে স্বজনদের মধ্যেই নানা কথা উঠল। এর আগে মীরা সুশীলাকে নিয়ে অশান্তির আগুন জ্বেলেছেন, এখন আবার স্নান প্রসঙ্গ, ব্রহ্মচর্য নিয়ে ঝড় উঠল। গান্ধীজী আশ্রমে গোপন সার্কুলার জারি করলেন। তিনি লিখলেন—মীরাবেন তাঁর পত্রে আমাকে (গান্ধীকে) রমণী বেষ্টিত রাবনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। যখন ঐ চিঠি পড়ি তখন আমি হাসি ও চিৎকার করি।

সুশীলার সাথে একসঙ্গে স্নান করা বিষয়ে গান্ধীজী জানান—'She bathes in the space behind the bath-tub (in which Gandhi takes his bath) and while she is bathing I keep my eyes tightly shut. I do not know the manner of her bathing...whether she bathes naked or with her underwear on. I can feel from the sound that she used soap. I have seen no part of her body which everybody here will not have seen.'

অর্থাৎ, সে (সুশীলা) গান্ধী যে বাথটবে স্নান করতেন তার পেছনে স্নান করত। তার স্নান করার সময় গান্ধীজি নিজের চোখ পুরো বন্ধ করে রাখতেন। সে নগ্ন হয়ে বা আন্ডারওয়ার পরে স্নান করত কিনা গান্ধীজি তা দেখতেন না। সে যে সাবান গায়ে মাখত সেটা তিনি তার গায়ে সাবান ঘষার শব্দে বুঝতে পারতেন। তার দেহের কোনও অংশই দেখেননি গান্ধীজি। আশ্রমেও কেউ সেটা দেখেনি।

'গান্ধীজির চতুর্থ ছেলে দেবদাস তাঁর পিতা ও সুশীলাকে নিয়ে নানা কটু কথা শুনে ধৈর্য হারান। তিনি সুশীলাকে পরোক্ষে তিরস্কার করেন। সুশীলার অস্বস্তি বাড়ে। সবচেয়ে অসুবিধায় পড়েন গান্ধীজী নিজেই। 'বা',

হরিলাল ও পরিবারের সকলেই গান্ধীজীর ব্রহ্মচর্য ও মেয়েদের অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়াটাকে নিন্দে করতে থাকেন।'...

পিতাকে কুকর্মে রত থাকতে দেখলে পুত্র এবং পরিবারের লোকজন কী করে নীরব থাকতে পারে? তাই গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর পরিবারের কারও সম্পর্ক ভালো ছিল না। জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিলালও এই জন্যই পিতাকে সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর বিপথগামী হবার অন্যতম কারণও এটা। গান্ধীজি নিজের স্বার্থ ছাড়া কিছুই বুঝতেন না। তাই ভারতের এক নম্বর নেতা জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর বংশ থেকে একজন নেতাও উঠে এলেন না। অথচ তাঁরই শিষ্য জওহরলাল নেহরুর বংশধররা আজও ভারতবর্ষে রাজত্ব করে চলেছেন।

ইতিপূর্বে নোয়াখালির কথা উল্লেখ করেছি। এবার সেই প্রসঙ্গে আরও কিছু বলব।

'১৯৪৫-৪৬ সালে গান্ধীজীর ব্রহ্মচর্যের 'মহাযজ্ঞ' অনুষ্ঠিত হয় নোয়াখালিতে। এই নোয়াখালি যাত্রা গান্ধীজীর জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। ব্রহ্মচর্যের এই মহাযজ্ঞের সাথী ছিলেন মনু গান্ধী ও সুশীলা নায়ার। এ নিয়ে বিষম ঝড় ওঠে। এ বিষয়ে সুশীলার বক্তব্যে কিছুটা সন্দেহ আছে। মনুর বক্তব্য যথাযথ বলেই মনে হয়। বেদ মেহতাকে সুশীলা জানান—মনুর অনেক আগে থেকেই আমি তাঁর সাথে শুতাম।...তিনি কখনো বলতেন—আমার পেছন দিকটায় ব্যথা করছে, চাপ দাও। আমি তাই করতাম, তিনি ঘুমাতেন। আগে এই ব্যাপারটিকে ব্রহ্মচর্য বলা হত না। এটা ছিল প্রাকৃতিক চিকিৎসার মতো। যখন লোকে মনু, আভা ও আমার সঙ্গে তাঁর শারীরিক স্পর্শের কথা বলতে শুরু করল, তখন থেকে ব্রহ্মচর্য কথাটার উদ্ভাবন।

বেদ মেহতার কাছে আভা গান্ধীর বক্তব্যটা প্রকাশ করা যেতে পারে। প্রশ্নোত্তরে মেহতা ও আভা বলেছেন ঃ

— তখনো কি আপনি কাপড় পরেই ছিলেন? তিনি ইতস্তত করছিলেন উত্তর দিতে। তারপর বললেন—তিনি আমায় কাপড় খুলে ফেলতে বললেন। আমার যতটা মনে পড়ছে, আমি পেটিকোট ও চোলি পরেছিলাম।

— কিন্তু তিনি কী পরেছিলেন?

— আমার মনে নেই তাঁর শরীরে বস্ত্র ছিল কিনা। আমি আর এ নিয়ে কিছু ভাবতে চাই না।'

(গান্ধীজীর আধ্যাত্মিক স্ত্রী ও সহযোগী মেয়েরা ঃ দিগ্বিজয় দে সরকার—পৃ.— ৯৯-১০০)।

বহু নারী-ই তাঁর কাছে এসেছিল গান্ধী-মাহাত্ম্য শুনে। তা ছাড়া তাঁর বিরাট ক্ষমতা হয়তো তাদের কাজে লাগবে এই ভেবে। কারও কারও জীবনে কাজে লেগেছে, কেউ কেউ অনেক কিছু দিয়েও কিছু পাননি। যেমন— সুশীলা পেয়েছিলেন। হয়েছিলেন স্বাধীন ভারতের স্বাস্থ্যমন্ত্রী। সোনজা শুধু ত্যাগই করে গিয়েছিলেন, পাননি কিছুই। এমনকী তাঁর প্রতি অহিংস সাধকের হৃদয়হীন নিষ্ঠুর সহিংস ব্যবহার দেখলে অবাক হতে হয়। সেই কথাই তুলে ধরছি এখানে ঃ

'সোনজা ঃ সোনজা সাইলেসিন (Sonja Schlessin) গান্ধীজীর সচিব ছিলেন ১৯০৭ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত। পরবর্তীকালে তাঁদের মধ্যে আর সাক্ষাৎ হয়নি। কিন্তু গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর আত্মীক যোগ ছিল গান্ধীজীর আমৃত্যু। সোনজা গান্ধীজীর রতন। তাঁর গুরু তাঁকে প্রায় অবহেলায় ফেলে আসেন। গান্ধীপুত্রের অত্যাচারও তাঁর মানসিক শান্তি বিঘ্নিত করে। গান্ধীর আদর্শে দারিদ্র্যকে সোনজা জীবনসঙ্গী করেছিলেন। সমালোচক অত্যন্ত সত্য কথা শুনিয়েছেন — তিনি বেঁচেছেন ও মরেছেন দরিদ্রের মত।

দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধী তখন অসংখ্য কাজে লিপ্ত। তাঁর সাহায্যকারী 'কেরানী ভাইয়েরা সামলাতে পারছেন না সব কাজ। অথচ তেমন যোগ্য একজন সচিব কোথায় পাওয়া যাবে? বন্ধু কলেনব্যাচকে (Kallenbach) সমস্যাটা জানালেন তিনি। তিনি জোগাড় করে দেন মাত্র সতের বছরের এই সদ্য যুবতী সোনজাকে। গান্ধী যাকে ভয় পেতেন রীতিমত আবার ভালও বাসতেন খুবই। দশ পাউন্ডের মাসিক মাহিনায় নিযুক্ত হলেন তরুণী সোনজা। চটপট কাজ করতেন তিনি। অল্পদিনেই সকল কিছু দখল নিয়ে নিলেন। তা নিয়েও অনেকের মুখ ভার। অবশ্য গান্ধীজীর বিশ্বাস ও স্নেহ অর্জন করতে তাকে কষ্টও করতে হয়েছে, পাল্টাতেও হয়েছে নিজেকে। ...সোনজা গান্ধীজীর অন্যান্য মেয়েদের মত ছিলেন না। অন্যরা তাঁর পূজারী, ভাবাবেগে গান্ধীকে ভাসিয়ে দিতে চান, কখনো নিজেদের সম্পদ বলেই

ভাবেন। আবার কেউ বা তাঁকে প্রায় পুতুল করে তুলতে চান। কিন্তু সোনজা তেমন মেয়ে নন। তিনি গান্ধীজীর আইন-আদালত, আন্দোলন-সত্যাগ্রহ সমস্ত কিছুতেই সক্রিয় সৈনিকের মত। একইসঙ্গে 'সেনাপতি ও ভাইসরয়'। তিনি গান্ধীর প্রতিটি বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। তাঁর এই সতর্ক নজরে গুরুর গুরুতর অসুবিধে সৃষ্টি হলেও সোনজা নাছোড়। গান্ধীজী পরবর্তী সময়ে নিজেই লিখেছেন—"Miss Sehlesin takes an opposite course of mine in all matters, but in some ways I place her character very much higher than that of you all." গান্ধীজীর রাজনৈতিক গুরু মহামতী গোখলে এই সময় গান্ধীজীর ফোনিক্স ফার্মে আতিথ্য গ্রহণ করলেন। এই মহামান্য অতিথির দেখাশোনার ভার ছিল মূলত মিলি গ্রাহামের উপর। সোনজাকে সাহায্যকারী হিসেবে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে সোনজাই গোখলের কাছে গ্রহণযোগ্য হলেন। শুধু তাই নয় গোখলে লিখলেন—'I have rarely come accross such purity, single-minded devotion to work and great determination as I have seen in Miss Sehlesin...I need hardly say it and yet I say that you must cherish her. Gandhi called her one of noblest being I have known.'

সোনজা গান্ধীজীকে অনেক বিপদ থেকে রক্ষা করতেন। অসাধু লোকজনকে গান্ধীর কাছে আসতে দিতেন না। আইন-আন্দোলন সামলাতেন। গান্ধীজী যখন জেলে তখন তিনি সমস্ত পরিবারের দায়িত্ব তাঁর কাধে তুলে নেন। কস্তুরবা যখন সত্যাগ্রহে অংশ নিতে গেলেন তখন এই সচিব সমস্ত মেয়েদের আন্দোলনমুখী করে তোলেন। এ সব ১৯১৩ সালের এপ্রিল মাসের কথা। সোনজা হাসতো কম। হাসলে তাকে সুন্দর দেখাতো। তখন তিনি কথাও বলতেন বেশি, হাসি-মসকরাও করতেন। কিন্তু যখন ক্লাসে পড়াতে যেতেন প্রায় সমস্ত দেহ কালো পোষাকে মোড়া ছোট-খাটো মেয়েটির গাম্ভীর্যকে উপেক্ষা করে কার সাধ্য! সোনজা এই সময়ে গান্ধীজীর বিবেকরক্ষক।

কিন্তু হায়, কী পেলেন তিনি। গান্ধীজী বড় মঞ্চে অভিনয়ের জন্য তৈরি হলেন। সমস্ত কিছু পিছনে পড়ে রইল।

গান্ধীজী ভারতে চলে আসার পরও প্রায় তেত্রিশ বছর তাঁর যোগাযোগ ছিল গান্ধীজীর সঙ্গে। গান্ধী তখন 'মহাত্মা'। দক্ষিণ আফ্রিকায় তখন মোহনদাসের ছেলে মনিলাল ফনিকস্ ফার্ম ও 'ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন' দেখাশুনা করতেন। সোনজাও ছিলেন সেখানে। কিন্তু অভিজ্ঞতা বড়ই তিক্ত। সোনজা সম্পর্কে তার অভিযোগ সব মিথ্যে না হলেও তাতে বাড়াবাড়ি ছিল আর ছিল কৃতজ্ঞতার অভাব। গান্ধীজী দেরীতে হলেও তা বুঝেছিলেন ও পুত্রকে সোনজার সঙ্গে মানিয়ে নিতে বলেছিলেন।

সোনজা একটি স্কুলে চাকুরী নিয়েছিলেন। অর্থকষ্টের মধ্যেই তাঁর দিনগুলো চলছিল। গান্ধীজীর কাছ থেকে তিনি দশ পাউন্ড বেতনের ছয় পাউন্ড মাত্র নিতেন। টাকা দিতে চাইলে বলতেন — এর বেশি আমার প্রয়োজন নেই। যদি বেশি নেই তবে তোমার (গান্ধীজী) আদর্শ থেকে বঞ্চিত হব। গান্ধীজী চিরদিনই ভাগ্যবান। এমন মেয়েকে তিনি পেয়েছিলেন সচিব-সখা-সেনাপতি হিসেবে। সোনজা সত্যিকারের শক্তির অংশ, আলোকের দূতি।

গান্ধীজীর সংস্পর্শে যে মেয়েরা এসেছেন তাঁরা ব্যথা পাবেন না তাও কি হয়! তাই চাকরির সুপারিশ চেয়ে সোনজা যখন গান্ধীজীর সাহায্য চান তখন গান্ধী হৃদয়হীনভাবে লেখেন—'I must refuse to plead guilty to all the charges you have noted against me. Why should I care about giving you a business certificate?' গান্ধীজীর মনে পড়েছিল ১৯১১ সালের বিশ্রী এক ঘটনার কথা। সোনজা গান্ধীজীকে কড়া কথা বলেছিল। কারণ, গান্ধীজি সোনজার টাইপ-রাইটার ব্যবহার করেছিলেন তাঁর অজান্তে 'হিন্দু স্বরাজ' পত্রিকার কাজে। কিন্তু এ কি 'মহাত্মা'র মত কথা! গান্ধীজী কেন যেন নেমে এসেছিলেন সাধারণ মাপের মধ্যে। যাক সে কথা। মহাত্মারা সব পারেন।

গান্ধীজী সোনজাকে ভারতে এসে আমেদাবাদের ন্যাশনাল স্কুলের শিক্ষিকা হতে বলেছিলেন। সে ১৯১৭ সালের কথা। গান্ধীজীর ইচ্ছে ছিল হয়তো দক্ষিণ আফ্রিকার তাঁর অনুগামীরা ভারতে আসুন ও তাঁর কর্মযজ্ঞের পরিধি দেখে যান। কিন্তু সোনজা রাজী হননি। তাঁর মনে অভিমান ছিল। যে গান্ধীর জন্য সে এতটা করেছে প্রাণ-মন-ঢেলে, তিনি তার মূল্য দিলেন না। হায় গান্ধী! তোমার তো তখন কত লোক, কত স্তাবক, কত স্নান

করানোর সাথী। কিন্তু সোনজা তো একজনও ছিলেন না।

সোনজা মারা যান ১৯৫৬ সালে। সুশিলা নায়ার এই নারীকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে বলেছেন—তিনি ও কস্তুরবা মহিলা সত্যাগ্রহের মাধ্যমে গান্ধীজীর মত পরিবর্তনে বাধ্য করেছিলেন।

অন্য কোন কারণে না হোক, গান্ধীজীর কালো দিনগুলিতে এক স্বল্প বয়সী নারী তাঁকে ও তাঁর বৃহৎ-বিচিত্র সংসারকে সঠিক লক্ষ্যে চালিত করেন বলে সোনজা সাইলেসিনকে ভোলা যাবে না, অন্তত ভোলাটা অমানবিক।'

(গান্ধীজীর আধ্যাত্মিক স্ত্রী ও সহযোগী মেয়েরা ঃ দিগ্বিজয় দে সরকার ঃ পৃ.—৪৪-৪৭)।

হে ভারতের এক নম্বর নেতা, অনেক ক্ষেত্রেই তোমার নেতৃত্ব ব্যর্থ। তোমার অহিংসা নীতি ছিল সুবিধাবাদী নীতি। তুমি নিজে খুশি মতো এই নীতি তৈরি করতে। তাই তোমার শিষ্যরাও এই অদ্ভুত অহিংসা নীতি বুঝতে পারত না। মানতে চাইত না। তোমার অহিংসা নীতিও আজ ব্যর্থ। কারণ, তুমি হিংসার অনলে জ্বলে অনেক অন্যায় কাজ করেছ। হে ব্রহ্মাচর্য সাধক, সুন্দরী যুবতী রমণীদের নগ্ন করে নিজে নগ্ন হয়ে তাদের সঙ্গে তোমার রাত্রিযাপন করাটা বেশিরভাগ মানুষই মেনে নিতে পারেননি। মেনে নিতে পারেননি তোমার আশ্রমের ও পরিবারের লোকজন। মেনে নিতে পারেননি তোমার রাজনৈতিক সহকর্মীদের অনেকেই। অনেকের মতেই এটা বিকৃত যৌনাচার। তাঁরা বলেন তুমি ব্রহ্মচারী নও, অধর্মচারী। তুমি ধর্মের নামে অধর্মই করেছ বেশি। হে মহাত্মা, তোমার স্বার্থে আঘাত লাগলেই তুমি হিংসায় জ্বলে উঠেছ। নিষ্ঠুর হয়ে আঘাত করেছ অতীতের অনেক উপকারীকেও। তাই আজ মনে হয় তোমার সার্থকতার চেয়ে ব্যর্থতাই বেশি। দ্বিচারিতা মস্তবড়ো অপরাধ—যা তুমি করে গিয়েছ সারা জীবন। তোমার চরিত্রের নোংরা দিকটা অনেকেই জানে না। তাই তোমাকে দেবতার স্থানে বসিয়েছে। কিন্তু সত্য চিরদিনই সত্য। তাকে চাপা দেওয়া যায় না। তাই আজ সবই প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। একটি রাজনৈতিক দল তার বাঁচার জন্য তোমার জয়ঢাক পেটালেও আসলে তুমি ব্যর্থ। আর তোমার সেই ব্যর্থতাকে চাপা দেবার জন্যই সেই দলই নেতাজির প্রতি অবিচার করেছে এবং আজও করে চলেছে। কিন্তু ইতিহাস কথা কয়। একদিন সব সত্যিই প্রকাশিত হবে।

অলোককৃষ্ণ চক্রবর্তী



অলোককৃষ্ণ চক্রবর্তীর জন্ম অধুনা বাংলাদেশের যশোর জেলায়। ১৯৩৫ সালে। আট ভাইবোনের মধ্যে তিনি অষ্টম সন্তান। লেখাপড়ার জন্য শৈশবেই কলকাতায় চলে আসেন। কৈশোরেই তাঁর সাহিত্য জীবন শুরু। অলোককৃষ্ণ একজন সুপ্রতিষ্ঠিত নেতাজি-গবেষক। নেতাজি অনুরাগী অলোককৃষ্ণ স্বদেশী ও প্রগতিশীল আন্দোলনের পরিবেশে বড়ো হয়ে উঠেছেন। নেতাজি বিষয়ে তথ্যভিত্তিক বহু গ্রন্থ রচনা করে তিনি নেতাজি-গবেষক হিসেবে জনপ্রিয়তার শীর্ষে। অলোককৃষ্ণ শুধু নেতাজি - গবেষকই নন, একজন প্রতিষ্ঠিত প্রতিভাবান লেখকও। সাহিত্যের সমস্ত শাখায় তাঁর অবাধ বিচরণ। অলোককৃষ্ণের বহু লেখা পাঠ্যপুস্তকে গৃহীত হয়েছে। তাঁর প্রায় প্রতিটি গ্রন্থই "বেস্ট সেলার"-এর মর্যাদা লাভ করেছে। তিনি স্বদেশে এবং বিদেশে বহু পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। এই গ্রন্থে তিনি গান্ধীজির মুখোশ খুলে দিয়েছেন। অহিংসার নামাবলী গায়ে দিয়ে যিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন আসলে তিনি সহিংস। সারা জীবন দ্বিচারিতা করে গেছেন। মুখে এক, মনে অন্য-এই ছিল তাঁর চরিত্র। গান্ধীজির জন্য দেশের অনেক ক্ষতি হয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলন ব্যাহত হয়েছে। দেশ ভাগ হয়েছে। এমনকী অনেক অন্যায় এবং নোংরা কাজ করেছেন তিনি।